
প্রাচীন
যুগের
কথা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VI of all High and Junior High Schools of West Bengal.
[Vide Notification No. T. B VI/H/79/141 dated 5.12.79]

প্রাচীন যুগের কথা

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

ডঃ অমিয়কুমার রায় এম. এ. পি. এইচ. ডি.
প্রধান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা
প্রাক্তন অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যাপক
উলুবেড়িয়া কলেজ

শান্তি লাইব্রেরী
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৭০০০০৯

PRACHIN JUGER KATHA

(Intended for class VI)

By

DR. AMIYA KUMAR ROY
M. A. P. H. D.
Head of the Dept (History)
CHARUCHANDRA COLLEGE
CALCUTTA.

প্রকাশক :
শ্রী প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তি লাইব্রেরী
১৩, কলেজ রো,
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
জয়কৃষ্ণ ঘোষ
ইউনিক প্রিন্টার্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা—৭০০০০৪

মূল্য : ৯·৪৮

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের লক্ষ্য

প্রকৃতি নিজের থেকে মানুষকে অন্নবস্ত্র যোগায়নি। এর জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষকে সদাসর্বদা সংগ্রাম করতে হয়েছে—প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের বাঁচার এই চেষ্টার কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস বলতে শুধু রাজারাজড়ার কাহিনী বোঝায় না; ভালভাবে বাঁচার জন্য প্রাচীনকাল থেকে মানুষ কি কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে সেই কাহিনীর নামই ইতিহাস।

ইতিহাস পাঠের সার্থকতা

কয়েক লক্ষ বছর আগে থেকে প্রায় আমাদের মত দেখতে মানুষ পৃথিবীতে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম তারা বহুদিন ধরে বনে জঙ্গলে, গাছের ডালে কিংবা পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। তারা গাছ-পাথর ছুঁড়ে বুনো জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করতো। কাঁচা মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। সেই মানুষই ধীরে ধীরে আগুন জ্বালাতে শিখলো, গ্রাম নগরীর পত্তন করলো। বুনো আওয়াজ ছেড়ে তারা ভাষা শিখলো, বিচিত্র সব হরফে লিখতে শুরু করলো। এভাবে পৃথিবীতে সভ্যতার সূত্রপাত ঘটলো।

আজ যে ধরণের সমাজে আমরা বাস করছি তা কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই সমাজ গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত সমাজ বা জাতির আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস পড়লে আমরা অতীতকালের মানুষ ও মানুষের সমাজ সম্পর্কে জানতে পারি, বর্তমানে যে অবস্থায় আমরা আছি তা বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যতে কি ধরণের সমাজ মানুষের মঙ্গল করতে পারে সেবিষয়েও আমরা চিন্তা করতে পারি। তাই মানবসমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানতে গেলে ইতিহাস ছাড়া আমাদের গতি নেই। পৃথিবীর সব জায়গায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ একসঙ্গে বা একই সময়ে ঘটেনি। ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু ও অন্যান্য বিভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক এক রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পূর্বে ইতিহাস রাজা, রাজবংশ এবং তাদের যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কাহিনী নিয়ে তৈরী হতো। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ঐতিহাসিকদের কাছে ছিল অজ্ঞাত ও অবহেলিত। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র মানবজাতির রাজনৈতিক বিবরণই যথেষ্ট নয়, অর্থনৈতিক জীবন এবং সমাজ সংস্কৃতিও ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসের কাজ হল সত্যানুসন্ধান। ইতিহাস আমাদের শুধু তথ্যই পরিবেশনে করে তা'নয় ইতিহাস থেকে আমরা নীতিশিক্ষাও লাভ করি। তাই নীতিবোধের জন্য আমাদের ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন। ইতিহাস আমাদের রাজনীতি শিক্ষা দেয়। ইতিহাস পড়লে আমাদের কল্পনা, স্মৃতি ও বিচার ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে।

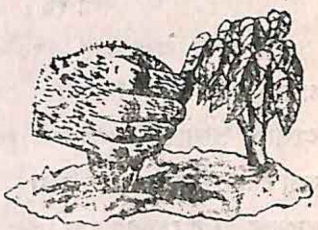
এই পৃথিবীর বয়েস বহু কোটি বছর। মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে। আদিম মানুষকে কেউ দেখেনি—তবে কি করে আদিম মানুষের কথা জানা যায়? তোমাদের কারো কারো বাড়ীতে ৫০/৬০ বছর আগেকার ছবি আছে। যাঁরা বড় লোক তাঁরা অনেক সময় সখ করে পূর্বপুরুষদের ছবি এঁকে রাখতেন। সে সময়কার জামা-কাপড়, আসবাবপত্র, অলঙ্কার কিছুই এখনকার মত দেখতে নয়। কিন্তু এইসব ছবি থেকে তখনকার দিনের জীবনযাত্রার কথা খানিকটা বুঝতে পারা যায়। সে সময় যাদের লেখা চিঠিপত্র বা ডায়েরী আছে তাদের সম্বন্ধে আরো বেশী খবর জানবার সুবিধে হয়। প্রাচীনযুগের ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি ও মুদ্রা দেখলে, সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করলে আমরা সেই যুগের ইতিহাস ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারি। এগুলিই হলো প্রাচীন ইতিহাস রচনার মূল উপাদান।

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান

সেই আদিমযুগে মানুষের ব্যবহার করা জিনিষপত্র দেখে সেই যুগের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী কেমন ছিল তা জানা যায়। মাটির নীচে যে সব জিনিস বহুকাল যাবত মানুষের অগোচরে ছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদদের চেষ্টায় সে সব আবিস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান ও খননের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে কত পল্লী ও নগরের ধ্বংসাবশেষ—কত বাড়ী, পথঘাট, প্রাসাদ, মন্দির, ভুক্তাবশেষ, মনোরম সুদৃশ্য পাত্র, মূর্তি, বিস্ময়কর সব চিত্র, অলংকার, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। পর্বতগুহার দেওয়ালে আঁকা পুরাকালের জীবজন্তু ও শিকারের অনেক ছবিও

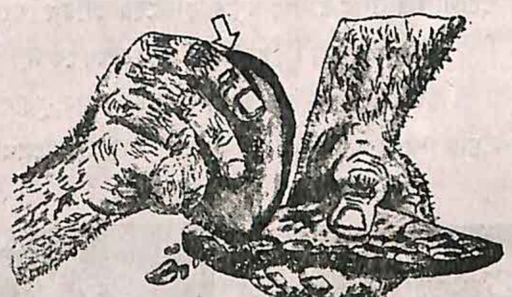
প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিই হলো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। তবে এসব জিনিস হতে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। তাই আমাদের অতীতকালের জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। এজন্য যত দিন কাটছে ততই নতুন নতুন তথ্য আবিস্কৃত হচ্ছে। তাই পণ্ডিতেরা এসব জিনিস দেখে অনুমান করে প্রায় সঠিক বলে দিতে পারেন সেগুলি কোন্ যুগের। তাঁদের সেই তথ্যের উপর নির্ভর করছে অতীতকাল সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও ধারণা।



মাটি খোঁড়ার যন্ত্র—আদিম যুগ

আর একদল পণ্ডিত (নৃতত্ত্ববিদগণ) মানুষের উৎপত্তি ও এর ক্রমবিবর্তনের চর্চা করে মানুষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। তাঁরা পৃথিবীর



সূক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র—আদিম যুগ

নানা জায়গার মানুষের দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য, মানুষের আচার ব্যবহার এবং তাদের সমাজের রূপ কেমন ছিল, তা গবেষণা করে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছেন।

ফসিল বা জীবাশ্ম

ফসিল বা জীবাশ্ম হলো পৃথিবীর শিলাস্তরে সংরক্ষিত অতীতের কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবশিষ্ট বা ছাপ। মাটির তলা থেকে তাদের পায়ের ছাপ, হাড়, কংকাল, ম্যামথের সম্পূর্ণ শব পাওয়া গিয়েছে। এসব থেকে আমরা অতীতকালের অনেক তথ্য জানতে পেরেছি।

আমাদের দেশের এবং আরও অনেক দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা পাথরের গায়ের লেখা থেকে জানতে পারা যায়। অনেকদিন স্থায়ী হবে বলে রাজারা

নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও বীরত্বের কথা এভাবে লিখে রাখতে ভালবাসতেন। পাথরের গায়ে লেখা হতো বলে এসব লেখাকে শিলালিপি বলা হয়। আবার পাথর ও ধাতুর ফলকে খোদাই করে লেখা হতো বলে একে উৎকীর্ণ লিপিও বলা হয়। সব সময় যে পাথরের গায়ে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের কথা লেখা হতো তা নয় আমাদের দেশের সম্রাট অশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক ধর্ম-উপদেশ ও রাজ্যশাসনের কথা খোদাই করে রেখেছিলেন। এছাড়া মিশরের দেবতার মন্দিরের গায়ে ও পাথরের উপর খোদাই করা কিছু লেখা পাওয়া গিয়েছে। ব্যাবিলনের পাথর ও মাটির ফলকের উপর, আরবে পশুর চামড়ার উপর এবং সিন্ধু উপত্যকায় তামার পাত্র ও সীলমোহরের উপর খোদাই করা নানা ধরণের লেখার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

মুদ্রা

প্রাচীন মুদ্রা থেকেও অনেক ইতিহাস-সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। মুদ্রাগুলির উপর রাজার মূর্তি, রাজত্বের তারিখ কিংবা অন্য কিছু লেখা থাকতো। সেই সব ছাপ দেখে কোন্ রাজা কতদিন রাজত্ব করেন তা জানা যায়। যেমন কুষাণ বংশীয় রাজা বিমকদ্‌ফিসের মুদ্রায় শিবের মূর্তি আঁকা রয়েছে এবং তাতে লেখা রয়েছে বিম-



প্রাচীন গ্রীক মুদ্রা



কণিষ্কের মুদ্রা

কদ্‌ফিস্ শিবের ভক্ত। ভারতে বিদেশ থেকে আগত গ্রীক, কুষাণ, শক প্রভৃতি জাতিগুলির সম্বন্ধে জানার ব্যাপারে মুদ্রা খুব সাহায্য করেছে।

লিখতে শেখার পর থেকেই মানুষ গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করে। মুদ্রাযন্ত্র তখনও আবিস্কৃত হয়নি। তাই এই সব গ্রন্থের অনুলিপি তৈরী হতো নানা জিনিসের উপর—যেমন তালপাতা, ভোজপাতা, পোড়ামাটির ফলক, চামড়া

ইত্যাদিতে। ভারতবর্ষে গাছের ছাল, তালপাতা ; সুমের ও ব্যাবিলনে পোড়ামাটির ফলকে ; চীনে বাঁশের সরু ফালি ও মিশরে প্যাপিরাস নামে একরকম উদ্ভিদ লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ

এদের বেশ কিছু অংশ নষ্ট হয়েছে পোকামাকড়ের উৎপাতে, আগুনে ও জলে। তা সত্ত্বেও মিশর-ব্যাবিলনের ধর্ম, সাহিত্য, গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, রোমান কবি ভার্জিলের ইনিড, ভারতের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আজও টিকে আছে। এসব প্রাচীন গ্রন্থগুলি ইতিহাসের অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। এগুলি থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির কথা জানা যায়।

প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে হেরোডোটাস, থুসিডাইডেস, টলেমী, সু-মা-কিয়েন, লিভি প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁদের লেখা থেকে তাঁদের সমসাময়িক কালের অনেক ইতিহাস জানা যায়। ভারতবর্ষে প্রাচীনযুগে বহু বিদেশী আসেন। গ্রীকদূত মেগাস্হেনিস-এর লেখা 'ইণ্ডিকা' থেকে ও চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাং-এর রচনা থেকে তাঁদের সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায়।

ঐতিহাসিক বিবরণ

প্রাচীনযুগের ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধানের কাজ এখনও চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন সব তথ্য পাওয়া যাবে যার ফলে প্রাচীনযুগের সঠিক ইতিহাস রচনা আরও সহজ ও নির্ভুল হবে।

অনুশীলনী

বিষয়ীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ইতিহাস পাঠের সার্থকতা কি ?

(২) কি উপায়ে প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় সংক্ষেপে বল।

(৩) অতীতকালে মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্র কিভাবে আবিস্কৃত হয়েছে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) মাটি খুঁড়ে কি কি জিনিস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ?

(খ) প্রাচীন মুদ্রা কিভাবে অতীত ইতিহাস জানতে সাহায্য করেছে ?

(গ) শিলালিপি কি ? কে কি উদ্দেশ্যে ওগুলি রেখে গেছেন ? ফসিল কাকে বলে ?

(ঘ) আমাদের দেশের কয়েকটি প্রাচীন পুঁথির নাম কর। ঐসব পুঁথি থেকে কি জানা যায় ?

(ঙ) প্রাচীনকালের কয়েকজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মানব সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানতে গেলে — ছাড়া গতি নেই।

(খ) গ্রীকদূত মেগাস্থেনিসের লেখা — থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেকে জ্ঞান আহরণ করা যায়।

(গ) হোমারের — ও — , ভার্জিলের — আজও টিকে আছে।

শুদ্ধ উত্তরটির নীচে √ এই চিহ্ন দাও।

(১) প্রকৃতি নিজের থেকে মানুষকে অন্নবস্ত্র জোগায়নি — হ্যাঁ/না

(২) ক্ষুধার্ত মানুষের বাঁচার চেষ্টার কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু — হ্যাঁ/না

(৩) পাথরের গায়ে আদেশ উৎকীর্ণ করেছেন — সম্রাট অশোক / চন্দ্রগুপ্ত/হোমার

(৪) প্রাচীনমুদ্রা থেকে অনেক সময় ইতিহাস সম্পর্কীয় মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা যায় —হ্যাঁ/না।

টীকা লিখ ঃ

(১) ফসিল (২) ঐতিহাসিক বিবরণ (৩) শিলালিপি (৪) প্রাচীন মুদ্রা (৫) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ ও তার ক্রমবিকাশ

সৃষ্টির আদিতে মানুষ কেন কোনো জীবেরই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব ছিল না। এখন থেকে প্রায় একশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। শ্যাওলার মতো এককোষী জীব থেকে ক্রমবিকাশের ফলে একদা পৃথিবীতে উদ্ভিদ, মাছ, পোকামাকড়, সরীসৃপ, পাখি ও পশুর জন্ম হয়।

লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলো। স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হলো বানর জাতীয় প্রাণীর। তারপরও কত লাখ বছর যে কেটে গেল কে জানে! এখন থেকে মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হলো গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীর—আর সবশেষে মানুষের।

আদিম মানুষের চেহারা

এইসব আদিম মানুষের কপাল ছিল ঢালু, চোখের ওপরে ভুরুর অংশ ছিল সোজা ও আলের মতো উঁচু, চোয়াল বেশ বড়ো, ঘাড় প্রায় ছিলই না, মস্তিষ্কের কোটর ছিল ছোট, আর হাঁটুর কাছের হাড় ছিল বাঁকা।

এদের চোয়াল খুব বড় হওয়ায় এরা সম্ভবতঃ আমাদের মতো কথা বলতে পারতো না। হাঁটুর কাছে এদের পায়ের হাড় বাঁকা থাকায় এরা সামনের দিকে ঝুঁকে পা টেনে চলতো। এদের মস্তিষ্ক বেশ ছোট হওয়ায় এদের বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ আমাদের চেয়ে কম ছিল।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভে গভীর মৃত্তিকাস্তরে আদিম মানুষের বহু মাথার খুলি, হাড়ের ফসিল বা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এসব মাথার খুলি ও হাড়গুলির টুকরো জোড়া লাগিয়ে পন্ডিতেরা বুঝেছেন, এসব আদিম মানুষ আমাদের মত মানুষ এবং গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর মাঝামাঝি কয়েকটি স্তরে ছিল।

জাভা মানুষ

কোন্ পথ বেয়ে মানুষ বর্তমান আকৃতি ধারণ করেছে, সে এক বিচিত্র কাহিনী। মানুষের কাছাকাছি চেহারার যে জীবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তার নাম **'অস্ট্রালো পিথেকাস'** বা **'দক্ষিণী বনমানুষ'**। অস্ট্রালো পিথেকাসের পর উল্লেখ করা যায় এক প্রকার প্রাণীর, যাদের প্রায় মানুষ আখ্যা দেওয়া যায়। এদের বলা হয় **পিথেকানথ্রপাস**। পিথেকানথ্রপাসকে প্রথমে পাওয়া গিয়েছে যবদ্বীপে। সেজন্য সে **'জাভা মানুষ'** নামে সাধারণ মানুষের কাছে বেশী পরিচিত। পাঁচ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত এই ধরণের মানুষকে পৃথিবীর বুকে পাওয়া যেতো।

পিকিং মানুষ

জাভা মানুষের পরেই যে শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তার নাম 'সিনানথ্রপাস'। এই মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গিয়েছে চীনের রাজধানী পিকিং শহরের কিছুদূরে সোকোতিয়েনের এক গুহার মধ্যে। সেই কারণে পণ্ডিতেরা এর নামকরণ করেছেন 'পিকিং মানুষ'। এই পিকিং মানুষ আনুমানিক তিন লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো। এরা তাদের কীর্তির চিহ্ন রেখে গিয়েছে গুহার মধ্যে। এই গুহায় পাওয়া গিয়েছে নানা ধরণের পাথরের হাতিয়ার। আর পাওয়া গিয়েছে পোড়া মাটি এবং ছাই-এর স্তূপ। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে 'পিকিং মানুষ' আগুনের ব্যবহার শিখে ফেলেছিল। আগুনের উপকারিতা গুহাবাসী মানুষ ভালই বুঝতে পেরেছিল। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে এবং বন্য জন্তুকে দূরে রাখার কাজে সহায়ক হওয়ার জন্য আগুন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ আগুনের সাহায্যে সে কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখেছিল।



পিকিং মানুষ



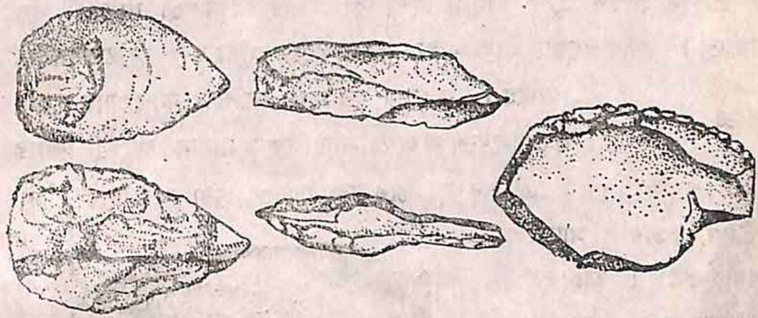
নিয়েণ্ডারথাল মানুষ

প্রাচীন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক হলো জার্মানীর ও মধ্য এশিয়ার নিয়েণ্ডারথাল মানুষ ও ফরাসী দেশের ক্রোমোনিয়ে॰ মানুষ।

খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ ঃ এই সময়ের মানুষ ক্ষুধা মেটানোর জন্য খেতো বনের ফল-মূল, মেয়েরা সংগ্রহ করে আনতো চেরি, বাদাম ও বুনো ঘাসের দানা। বিভিন্ন জন্তুর মাংসও ছিল এদের প্রিয় খাদ্য। এমনকি মানুষের মাংসেও এদের অরুচি ছিল না। এরা কিন্তু কোন ফসল উৎপন্ন করতে পারতো না। তাই ক্ষুধা মেটানোর জন্য বনজ ফল-মূল সংগ্রহের সন্ধানে এদের যাযাবর জীবন যাপন করতে হতো।

যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে কাজ চালাতো সে যুগকে প্রস্তর যুগ বলে। মানুষ সভ্য হবার ঠিক আগের অবস্থাকে পণ্ডিতরা প্রস্তর যুগ বলেন। প্রস্তর যুগের আরম্ভ অন্ততঃ ৫০,০০০ বছর পূর্বে শুরু হয় এবং ৫০০০ বছর আগে তার শেষ। এই দীর্ঘ ৪৫০০০ বছর প্রস্তর যুগ চলেছিল। ক্রমে ক্রমে এসময়ে মানুষের জীবনে অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন

প্রস্তর যুগ



পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

হয়েছে। তাই প্রস্তর যুগকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ। পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে শুরু করে। অবশ্য এই অস্ত্রগুলি ছিল ভাঙ্গা পাথরের সামিল। এই সব অস্ত্র নিয়েই মানুষ দল বেঁধে শিকার করতো। শিকার ও বন্যজন্তুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পাথরের যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো তা নিতান্তই বিশেষত্বহীন ছিল। ভারী পাথুরে হাতুড়ির আঘাতে ভেঙ্গে পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী করা হতো ছুরি এবং কুঠার জাতীয় অস্ত্র, বর্শার অগ্রভাগ, গদা ইত্যাদি। এইসব হাতিয়ার কাছাকাছি জায়গা হতে ব্যবহার করা হতো। এইসব হাতিয়ার ব্যবহারের জন্য দৈহিক বল ও মনের সাহস দুয়েরই প্রয়োজন ছিল বেশী। এই সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা দল বেঁধে শিকার করতো, মাছ ধরতো। পুরুষেরা পশু শিকার ও মাছ ধরতো এবং মেয়েরা বনের ফলমূল সংগ্রহ ও সন্তান পালন করতো। এই শিকারী জীবনে মানুষের প্রধান খাদ্য পশুর মাংস আর পশুর চামড়া হলো তার শীতের পোষাক। খাদ্যের সন্ধানে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো; কারণ খাদ্য সংগ্রহই ছিল তাদের একমাত্র বৃত্তি।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

জীবনধারা

মানুষ তখনও চাষবাস বা পশুকে পোষ মানাতে শেখেনি। মানুষ এই সময় হতেই শীতে আশ্রয় নিতো পাহাড়ের গুহায় আর গরমের সময় অস্ত্রের সাহায্যে গাছের ডাল বা বাঁশ কেটে অথবা নানা জাতীয় গাছ দিয়ে ঘর তৈরী করতো। কৃষি, পশুপালন অথবা খাদ্য উৎপাদন রীতির সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয়ই ছিল না। ধাতুর ব্যবহারও তাদের কাছে ছিল অজানা।

গুহাচিত্র

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ গুহা কিংবা গাছ পাতার ছাউনি তৈরী করে থাকতো। এসব গুহায় লাল, সাদা, কালো রঙের আঁকা ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ফ্রান্সের লা মুথ ও পেয়ার-নন-পেয়ার গুহায় ও স্পেনদেশে আলতামিরার গুহায় নানান ধরণের শিকার ও নাচের ছবি আছে। এই সব গুহাচিত্রে দেখা যায় যে তারা বর্শা দিয়ে হরিণ, বাইসন, গণ্ডার ও ম্যামথ শিকার করছে। ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিঙ্গনপুর গ্রামের গিরি গুহাতেও কিছু কিছু প্রস্তর যুগের আঁকা ছবি পাওয়া গিয়েছে।

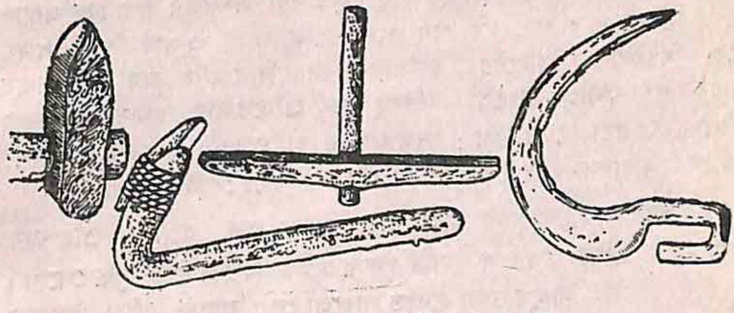


আলতামিরার গুহাচিত্র—বরাহ

নতুন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষদিকে প্রকৃত মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এদের মস্তিষ্কের কোটর ছিল বড়, চোখের উপরের হাড় সোজা ও আলের মত উঁচু ছিল না; আর চোয়াল আদিম মানুষের তুলনায় ছোট ছিল। হাটুর কাছের পায়ের হাড় সোজা আর উঁচু বুক বেশ স্পষ্ট ছিল। মস্তিষ্ক বড় হওয়ায় এদের যথেষ্ট বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তি ছিল। চোয়াল ছোট হওয়ায় এরা বেশ স্পষ্টভাবে কথাবার্তা বলতে পারতো। পায়ের হাড় সোজা হওয়ায় এরা খাড়া হয়ে হাঁটতে পারতো। প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান হয়েছিল এখন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। শুরু হয়েছিলো এক নতুন যুগ…ভারতে সেই নতুন যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বেলুচিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তান) ও দক্ষিণ ভারতে। এইযুগে বছরের পর বছর পরীক্ষা করে সেই মানুষ পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলিকে ছোট, মসৃণ ও সুতীক্ষ্ন করে তুললো। পাথর খণ্ডে ছেঁদা করে তাতে কাঠের হাতল জুড়ে নানারকম অস্ত্র তৈরী করতে লাগলো। কাঠের মাথায় পাথর জুড়ে তৈরী

করলো ধারালো তীর, বর্শা ; আগে যা খোন্তা ছিল, এখন তা হয়ে উঠলো কুড়ুল, নিড়ানির যন্ত্র। পাথরকে কেবল ধারালোই করলোনা তাতে দাঁতের মত



নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

খাঁজ কেটে কাস্তের মত হাতিয়ার বানালো। ছিদ্র করতে শেখায় তারা হাড় দিয়ে সুঁচের মত জিনিস তৈরী করলো। এরাও কিন্তু ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র তৈরী করতে তখনও শেখেনি। পন্ডিতেরা তাই এই যুগটার নাম দিয়েছেন নতুন প্রস্তর যুগ।

নতুন নতুন পাথরের মসৃণ হাতিয়ার ও সরঞ্জাম তৈরী করার সঙ্গে, এই যুগের মানুষ আর একটি নতুন জিনিস শিখলো ; তা' হলো পশুপালন। কি করে বন্য পশু বন্দী করে তাকে পোষ মানাতে হয় সে কৌশলও তারা বের করলো। মানুষের পোষ মানা প্রথম জীব হল কুকুর। তারপর বশ মানে ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি তৃণভোজী পশু। এই

পশুপালন

গৃহপালিত পশুর দল মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। বিভিন্ন জন্তু শিকারে কুকুর ছিল তার প্রভুর সহায়ক। অন্য কোনো খাদ্য না পাওয়া গেলে এই গৃহপালিত পশুদের মাংস খেয়েই মানুষ তার ক্ষুধা মেটাতো। ছাগল, গরু প্রভৃতি প্রাণী জোগাতো দুধ আর সেই সঙ্গে সংগৃহীত হতে লাগলো পশুর চামড়া ও পশম।

এর পরেই এল মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন। আমরা ইতি-পূর্বেই জেনেছি প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে মানুষ বনের ফলমূল যা পেতো তা-ই খেতো। জীবজন্তু মেরে তার কাঁচা মাংস খেতে তারা অভ্যস্ত ছিল। পরে আগুন জ্বালাতে শিখে তারা মাংস ঝলসে নিয়ে খেতে শিখলো। নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করার পরিবর্তে নিজেরাই তা উৎপাদন করতে শিখলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা এক গৌরব জনক

খাদ্য উৎপাদক

বিপ্লব! একদিন মানুষ একটি ফল খেয়ে তার আঁটিটি গুহার বাইরে ফেলে দিলো। তখন ছিল বর্ষাকাল। কয়েকদিন পর দেখা গেলো আঁটিটির ভেতর দিয়ে একটা চারাগাছ বেরিয়েছে। মানুষ অবাক হয়ে সেই

চারাগাছটি দেখতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে সেই চারাগাছ বড় হতে লাগলো এবং তাতে ফল ধরলো। মানুষ জানলো বীজ পুঁতলে গাছ হয়। এভাবে কৃষিকাজের সূত্রপাত ঘটলো। নতুন প্রস্তরযুগের মানুষেরা ইচ্ছেমত শস্য জন্মাবার জন্য চাষ আবাদ আরম্ভ করলো এবং গম, যব, ধান ও নানারকম কলাই ও শাকসব্জি উৎপাদন করতে শিখলো। পাথরের কোদাল-শাবল দিয়ে জমি চাষ করে মানুষ নানারকম শস্য ফলাতে লাগলো। কিন্তু একই জমিতে বারবার ফসল জন্মাবার পর জমির উর্বরতা কমে গেলো ; ফলে ফলনও কম হলো। তখন মানুষ বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য অন্য জায়গায় সরে যেতে লাগলো।

শেষে নদী বা জলাশয়ের ধারে চাষ আবাদ শুরু হলো। প্রতি বছর বন্যার ফলে জমির উপর পলিমাটি পড়ায় জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পেলো। মানুষ তখন বুঝতে পারলো যে পলিমাটি জমির উৎপাদন শক্তি বাড়ায়। ইতিমধ্যে তারা জেনেছিলো গোবরে বীজ দিলে তাড়াতাড়ি গাছ জন্মায়। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে জমিতে সার দেওয়া প্রথার প্রচলন হয়।

কৃষিকাজ

পৃথিবীর কোথায় প্রথম চাষ আবাদ প্রথম শুরু হয় তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। তবে অনেকে মনে করেন যে বর্তমান কালের থাইল্যান্ড, আরবদেশের সীমান্তের জলাধারে ও পারস্যের কোনো কোনো অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রথম শুরু হয়। প্রাচীনযুগের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তখনকার মানুষের ব্যবহৃত কাঠের লাঙ্গল এবং নিড়ানি যন্ত্র।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ ছিল গুহাবাসী, নতুন প্রস্তরযুগে মানুষ হলো গৃহবাসী। মানুষ যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্তে আনলো তখন থেকেই তাকে ত্যাগ করতে হলো যাযাবর বৃত্তি। যেখানে চাষ সেখানেই বসবাস গড়ে উঠলো। বসবাসের জন্য গড়ে তুললো ঘরবাড়ী। সেকালের ঘরবাড়ী সাধারণতঃ নলখাগড়া, ডালপালা আর কাদা দিয়ে তৈরী হতো। কিছুকাল পর এই ঘরবাড়ী যখন ভেঙে পড়তো তখন তারই ধ্বংসের উপর আবার নতুন করে ঘর তোলা হতো। এইভাবে আবর্জনা জমে জমে একটি ছোটখাটো টিলা গড়ে উঠতো। গ্রীসের উপকূল, তুরস্ক ও ইরাণের উপত্যকায় এবং সিরিয়ায় এই রকম অসংখ্য টিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ঘরবাড়ী আবার পাথর দিয়েও তৈরী হতো। এই যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাথরের সিঁড়ি, কপিকল, ভারোত্তলন দন্ড ও কব্জা পাওয়া গিয়েছে। কপিকল ও চাকার সাহায্যে বড় বড় পাথরের খণ্ড একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। এভাবেই নানাস্থানে পাথরের ঘরবাড়ী তৈরী হতো। শত্রু ও হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ ঘরের চারদিকে থরে থরে পাথর সাজিয়ে তৈরী করতো দেওয়াল।

ঘরবাড়ী

কখনও হ্রদের মধ্যে খুঁটি পুঁতে তার ওপর বাড়ী তৈরী হতো। প্রায় ১০০ বছর আগে সুইজারল্যাণ্ডে একটি হ্রদের জল শুকিয়ে যাওয়ায় এইরকম অনেকগুলি ব্যাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

মৃৎশিল্প

চাষের ফসল ঘরে তুলে রাখতে চাই পাত্র। আবার জল ধরে রাখা, রান্না-বান্না করবার বা খাবার দাবার জন্যও চাই পাত্র। পাথর খুঁজে বা চামড়া দিয়ে এইসব পাত্র তৈরী করতে অনেক অসুবিধে ছিল। এই তাগিদ থেকেও তারা একদিন মাটি দিয়ে পাত্র তৈরী করবার কৌশল রপ্ত করলো। রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে নিলে মাটির পাত্র জলও শুষে নেয়না আবার বৃষ্টিতেও গলে যায় না। তারা তাই মাটির তালকে জল দিয়ে নরম করে নিয়ে হাত দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে নানা ধরণের বাসনপত্র তৈরী করতে শিখলো। তারপর সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে পুড়িয়ে নিতে লাগলো। এতেও কিন্তু অনেক সময় লাগে। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে তারা একদিন কুমোরের চাক তৈরী করলো। ঘুরন্ত চাকের কেন্দ্রে একতাল কাদা ফেলে সহজে এবং দ্রুত তালে তাকে ইচ্ছেমত রূপ দেওয়া গেলো। এগুলি হলো আগের তুলনায় অনেক নিখুঁত এবং অনেক কম সময়ে প্রস্তুত। প্রথমে এই ধরণের পাত্র মসৃণভাবে তৈরী হতো না। পরে উন্নত কৌশলের সাহায্যে মাটির তৈরী মসৃণ পাত্রের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হতো নানাধরণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকাজ। এই কাজে দৈহিক শক্তির তেমন প্রয়োজন হতো না।

বয়নশিল্প

নতুন প্রস্তুর যুগের শেষের দিকে বয়ন বিদ্যার আবিস্কার হয়। আদিমযুগের প্রথমপর্বে মানুষ শীত ও রোদ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মরা প্রাণীর ছাল দিয়ে তৈরী করতো তাদের পোষাক। ক্রমশঃ সে ঘাস, শেকড় এবং পশুর লোম থেকে সুতো তৈরী করার কৌশল আয়ত্ত করলো এবং সেই সুতো দিয়ে বুনতে শিখলো কাপড়, মাছ ধরার জাল। অনুমান করা যায় যে কাপড় বোনার জন্য নতুন প্রস্তর যুগের মানুষকে টাকু ও তাঁত উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। পণ্ডিতদের ধারণা মধ্যপ্রাচ্যে বোনা কাপড়ের প্রথম জন্ম হয়। আমাদের দেশে সিন্ধুবাসীরা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কিছু পরে তুলোর চাষ আরম্ভ করে। একই সময়ে পারস্যেও পশম বস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

পশুকে পোষ মানাবার পর মানুষ বলদ আর গাধার পিঠে চাপিয়ে

দিতো মালপত্তর। বুদ্ধি করে নিজেও তাদের উপর চেপে বসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতো। পরে তারা আবিষ্কার করলো চাকার গাড়ী। বলদ টানা এই সব গাড়ীর চাকা প্রথমে ছিল নিরেট। চাকা ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল না। অনেক পরে মানুষ চাকা ঘোরাবার কৌশল বের করেছিল। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে মোট বওয়ার কাজে গাধার ব্যবহার ছিল খুব বেশী। তারপর উট ও ঘোড়াকে এই কাজে লাগানো হয়। নদীপথে চলার জন্য গাছের গুঁড়ি থেকে প্রস্তুত শালতি জাতীয় সরু ডোঙ্গা এবং চামড়ার তৈরী চ্যাপ্টা গোলাকার জলযান ব্যবহৃত হতো। নল খাগড়া জাতীয় গাছের আঁটি বেঁধে বা কাঠের পাশে কাঠ বেঁধে লোকে ভেলাও তৈরী করতে জানতো।

পরিবহন

নতুন প্রস্তরযুগে চাষ আবাদ শুরু হওয়ায় মানুষকে এখন খাদ্যের সন্ধানে দূর দূরান্তে দিনরাত ছুটোছুটি করতে হয় না। এখন সে যাযাবরের জীবন ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে কৃষিক্ষেত্রগুলির কাছে বসবাস করতে থাকে। এইভাবে সৃষ্টি হয় পল্লী। স্থায়ীভাবে একজায়গায় বাস করার ফলে গড়ে উঠে সমাজ ও সমাজবদ্ধজীবন। তাই বাঁচার তাগিদে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই দেখা যায় সেই যুগে ঘরবাড়ীগুলি পরস্পরের সঙ্গে রাস্তা দেয়ে যোগ করা ছিল। বসবাস বা চাষের জন্য জঙ্গল সাফ, জল নিকাশের নালি তৈরী, বন্যা অথবা বন্য পশুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা—এ সবের জন্য কয়েকটি পরিবারকে একসঙ্গে কাজ করতে হতো। এই সহযোগিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিখা তৈরীর ক্ষেত্রে। এভাবে মানুষের জীবনে স্থিতি যখন আসে তখন এক অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজের নিজের বৃত্তি অনুযায়ী ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়; তাদের মধ্যে কোনো কোনো গোষ্ঠী পোড়ামাটির কাজ করতো, কোনো কোনো গোষ্ঠীর কাজ ছিল বস্ত্রের যোগান দেওয়া, কেউ কেউ বা পরিচয় দিতো শিকারী রূপে। এভাবে এক এক গোষ্ঠী নিয়ে পত্তন হয় এক একটি গ্রামের।

সমাজবদ্ধজীবন

একই স্থানে দলবদ্ধভাবে দীর্ঘকাল বাস করায় এবং একযোগে কাজ করায় এখন নিজেদের মধ্যে মনের ভাব ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের প্রয়োজন ঘটে। মনের ভাবে সুস্পষ্টভাবে পরস্পরকে জানানোর জন্য সব কিছুরই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছিল একটা না একটা নির্দিষ্ট নাম বা শব্দের। এই সব নাম বা শব্দ দীর্ঘকাল ব্যবহার করায় সেগুলি স্থায়ী ও সর্বসম্মত রূপ পায়। এভাবেই সৃষ্টি হয় ভাষার।

ভাষার উদ্ভব

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ লক্ষ্য করলো প্রকৃতির অনেক কিছুই তাদের শক্তি ও বুদ্ধির বাইরে। প্রকৃতির কোন কোন শক্তি তার বন্ধু আবার কেউ কেউ তার শত্রু। তারা দেখলো শস্য উৎপাদনের জন্য চাই বৃষ্টি ; বিদ্যুৎ অনেক কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে ; আগুন সব কিছু পুড়িয়ে দিতে পারে ; সূর্যের তাপ না পেলে ফল পাকে না। প্রকৃতির এই সব শক্তি তাদের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। তাই প্রত্যেক শক্তির পেছনে তারা এক একজন দেবতা কল্পনা করে নেয় এবং তাদের তুষ্ট করার জন্য পুজো করতে থাকে। এভাবে মানুষের ভয়, বিস্ময় ও অন্ধবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে দেবতাদের জন্ম হয়। এভাবেই আদিম ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ঘটে। একেশ্বরবাদের ধারণা তখনও অনেক দূরে। সে যুগে মানুষ বিশ্বাস করতো যে মৃত্যু জীবনের উপর পুরোপুরি ছেদ আনতে পারে না। তাই কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই ব্যক্তি জীবিতকালের যে সব জিনিস ব্যবহার করতো (যেমন শস্যের দানা, হাতিয়ার, অলংকার ইত্যাদি) সেগুলি তার মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হতো। সেযুগে মূর্তি পুজোর প্রচলন ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবত্ব আরোপের প্রথা ছিল। প্রথম যুগে মানুষের ভক্তির প্রধান পাত্র ছিলেন সূর্যদেবতা ; পরের যুগে প্রধান উপাস্যা হলেন শস্যের দেবী।

ধর্মবিশ্বাস

মিশর, সিরিয়া, ইরান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এমন কি ইংলন্ডেও নতুন প্রস্তরযুগের সমাজে মাটির তৈরী কিংবা পাথরের খোদাই করা এক দেবী মূর্তির পুজো করা হতো। একেই মাতৃকা দেবী বা উর্বরতার দেবী বলে মনে করা হয়।

এইযুগের মানুষের সৌন্দর্যবোধ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিজেদের শরীরে এরা রং মাখাতো এবং রং বেরঙের পাথর ও ঝিনুকের মালা এরা পরতো। এই যুগের মানুষ মাটির পাত্র তৈরী করে রং মাখিয়ে তার উপর নক্সা আঁকতো। পাথর ও হাড়ের উপর আঁকা জীবজন্তুর অনেক ছবি এই যুগে পাওয়া গিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে এরা গুহার গায়ে রং, রক্ত আর চর্বি ব্যবহার করে প্রাচীন কালের বুনো ষাঁড়, হরিণ, অতিকায় হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকতো। শিকারের কাজ সহজ ও নিরাপদ হবে ভেবে এদের যাদুকররা জানোয়ারের চামড়া গায়ে জড়িয়ে হরিণের শিং মাথায় এঁটে নাচতো। কখনও কখনও এরা জানোয়ারের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাকে ঘিরে সমবেত-ভাবে নাচতো আর প্রতিমূর্তিতে বর্শাবিদ্ধ করতো।

শিল্পবোধ

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) আদিম মানুষ বলতে কি বোঝ? এদের সঙ্গে খাঁটি মানুষের কি পার্থক্য ছিল?

(২) পিকিং মানুষ কাকে বলে? পিকিং মানুষের প্রধান কীর্তি কি?

(৩) প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ?

(৪) প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৫) প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

(৬) নতুন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র কেমন ছিল? সেগুলি কি কাজে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হতো?

(৭) নতুন প্রস্তর যুগে কিভাবে কৃষির অবিষ্কার হলো?

(৮) নতুন প্রস্তর যুগের ঘর বাড়ীর বর্ণনা কর।

(৯) মৃৎশিল্প কোন্ যুগে কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল?

(১০) উৎপাদিকা দেবদেবীর উপাসনা কিভাবে প্রচলিত হয়?

(১১) সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজন মানুষ কেন অনুভব করলো?

(১২) গুহাচিত্র কোন্ কোন্ অঞ্চলে আবিস্কৃত হয়েছিল? গুহাচিত্র অাঁকার উদ্দেশ্য কি?

(১৩) নতুন প্রস্তর যুগে মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল?

(১৪) উৎপাদিকা দেবদেবীর উপাসনা কিভাবে প্রচলিত হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(১) আদিম মানুষেরা ভালভাবে কথা বলতে পারতো না কেন? (২) আদিম মানুষেরা পা টেনে টেনে হাঁটতো কেন? (৩) প্রস্তর যুগ ক'ভাগে বিভক্ত ও কি কি? (৪) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষেরা খাদ্য উৎপাদক ছিল না খাদ্য সংগ্রাহক ছিল বল। (৫) কুমোরের কাজে চাক ব্যবহৃত হওয়ায় কি কি সুবিধে হয়েছিল?

(৩) **শুদ্ধ উত্তরটির নীচে ✓ এই দাগ দাও ঃ**

(ক) আদিম মানুষেরা পাথর ব্যবহার করতো কারণ—তারা অন্য রাজ্য আক্রমণ করার জন্য/জীব জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য/নিয়মিত খেলাধুলার জন্য।

(খ) মানুষ সর্বপ্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে—ব্যাবিলনে/মিশর অঞ্চলে/পিকিং অঞ্চলে।

(গ) প্রাগৈতিহাসিক কালের গুহাচিত্র পাওয়া যায়—আলতামিরায়/অজন্তায়/ইলোরায়

(ঘ) বোনা কাপড়ের প্রথম জন্ম—ভারতবর্ষে/মধ্যপ্রাচ্যে/ইংলন্ডে

(ঙ) পিথেকানথ্রোপাসকে বলা হয়—পিকিং মানুষ/জাভা মানুষ / ভারতীয় মানুষ

(চ) পিকিং মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করতো—খৃষ্টপূর্ব ৮ লক্ষ বছর আগে/খৃষ্টপূর্ব ৫ লক্ষ বছর আগে/খৃষ্টপূর্ব ৩ লক্ষ বছর আগে।

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

পাথর দিয়েই এতদিন মানুষ হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতো। একদিন তারা দেখলো একরকম আকরিক পাথর অত্যধিক তাপে তরল হয়ে পড়েছে এবং পরে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করেছে। এই পাথর হ'ল আসলে একরকম ধাতু যা তামা বা তাম্র নামে পরিচিত।

পাথরকে ইচ্ছেমত রূপ দেওয়া কঠিন ও কিন্তু তামাকে গলিত অবস্থায় ছাঁচে ঢেলে যেমন ইচ্ছে তেমন রূপ দেওয়া যায়। তাই সে যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির বদলে তামার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা জানলো তামার সঙ্গে টিন মেশালে তা' আরও মজবুত হয়। তামা ও ও টিনের মিশ্র ধাতুকে বলে ব্রোঞ্জ। মানুষ তখন ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে। লোহা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে এই যুগকে বলা হয় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষে এই যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পৃথিবীর সব জায়গায় এক সঙ্গে এক যুগ শেষ হয়ে অন্য যুগ আরম্ভ হয়েছে, একথা বললে কিন্তু ভুল হবে। এক দেশে যখন ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছে, অন্য দেশে তখনও হয়ত প্রস্তর যুগ চলছে।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

ধাতুনির্মিত কুঠার, বর্শা, লাঙলের ফলা, তলোয়ার, তীরের ফলা ইত্যাদি মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে। মানুষ কাঠ থেকেও নানারকম জিনিস তৈরী করতে আরম্ভ করে। কাঠের লাঙল ও ধাতুর তৈরি লাঙলের ফাল দিয়ে তারা সহজেই চাষের কাজ করতে পারে। গৃহপালিত পশুকেও কৃষি ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয়। তারা কাঠের নৌকাও বানাতে শেখে। নিজেদের বাসের জন্য বড় বড় কাঠের বাড়িও বানানো আরম্ভ হয়। উন্নত ধরনের কুমোরের চাকার ও তাঁতের প্রচলন হওয়ায় মানুষ অনেক সহজে বাসনপত্র তৈরী করতে শেখে, কাপড় বোনাও সহজ হয়। তারা ধাতুর পাত্রে মাংস ও শবজি রান্না করতে শেখে। এর

বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন

ফলে খাওয়া-দাওয়ারও পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এইভাবে সমাজে মানুষ বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষক ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য করায় কৃষিকার্যে যেমন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করলো তেমনি অন্যান্য পেশার লোকেরা নিজের নিজের বৃত্তিতে পুরুষানুক্রমে কাজ করায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠে।

নদীর তীরে সভ্যতার বিকাশ

সভ্যতার সূচনা হয় বড় বড় নদীর তীরে। নদীর দু'তীরের জমিতে পলি মাটি জমে বলে ভাল ফসল ফলে। তখনও ভাল রাস্তাঘাট হয়নি, তাই নদীর পথে নৌকায় যাতায়াত করাই সুবিধাজনক ছিল। নদীর ধারে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। মানুষেরা এক একটা দল গঠন করে এই সব গ্রামে বাস করতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ও চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে উর্বর স্থানে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় নদীর ধারে নতুন নতুন সমাজ দেখা দিতে থাকে। ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড় হয় এবং কালক্রমে বড় গ্রাম শহরে পরিণত হয়। এইভাবে প্রথম সভ্যসমাজের উৎপত্তি হয়। যে অঞ্চলে চাষের পক্ষে উপযোগী ছিল সেখানে তারা খাদ্যশস্য, তরি-তরকারী, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। জলসেচনের ব্যবস্থা করেও তারা ফসল ফলাতে থাকে। অন্যদিকে যে জায়গা কৃষিকাজের পক্ষে ততটা উপযোগী ছিল না সেখানে মানুষ পশুপালন শুরু করে। বিশেষ করে যে সমস্ত জাতি বা দল পূর্বে শিকারের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা বুঝলো পশুপালন অনেক লাভজনক বৃত্তি। তাই এই সব পশুপালক জাতি মাংস, পশম, চামড়া, দুধ ইত্যাদি জিনিস তৈরী করতে থাকে এবং সুবিধেমত জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। কাজেই এক একটি জাতি বা দল হয় কৃষিকাজে নয়ত পশুপালনের মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। একে ইতিহাসে প্রথম সামাজিক শ্রম-বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কৃষিজীবী ও পশুপালক

পশুপালনের ও কৃষির উন্নতির প্রয়োজনে পশুপালক ও কৃষিজীবি জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য তারা কাছাকাছি বাস করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতার ও উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতির লেনদেন করতে থাকে। ফলে, কৃষি ও পশুপালনে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কৃষিতে লাঙলের ও পশুর ব্যবহার এবং পশুপালনে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন।

এইসব পরিশ্রমের কাজ পুরুষেরা করতে থাকে। এক সময় ছিল যখন সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়েদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। মেয়েরা তখন ঘরের কাজেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। পুরুষেরা পরিবারের প্রধান হয়ে উঠে এবং জাতি বা দলে তারাই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এইভাবে সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

সমাজে পুরুষদের কর্তৃত্ব

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের মানুষের আর আগের মত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকার দরকার ছিল না। জিনিসপত্র তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ কিছু সঞ্চয় করতে থাকে। চাষের ফসল ও পশু বাড়তি হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম একটা জাতি বা দল তাদের বাড়তি জিনিসপত্র অন্য একটা জাতির বাড়তি জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করতে থাকে। কোন জাতি হয়তো চামড়ার বদলে কিছু ধান নিয়ে নিল। এমনি করে বিনিময় প্রথার সূত্রপাত হয়। তখনও মুদ্রা আবিষ্কার হয়নি, তাই বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই চলতো এই ব্যবসা বাণিজ্য।

বিনিময় প্রথার প্রচলন

এই সময়ে সমাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করার ভার এক দল নিয়ে থাকে। যেমন চাষী, তাঁতী, কুমোর, পশুপালক, ছুতোর প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরী করে নিজের নিজের কাজে দক্ষতা অর্জন করে। যে যা তৈরি করতো, সেটা হতো তার নিজেরই ব্যক্তিগত জিনিস। এইভাবে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে জিনিসপত্রের বিনিময় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যে ধান বোনে তার হয়তো কাপড় কিংবা তাঁতীর খাবারের দরকার। চাষী ধান দিয়ে কাপড়, আর তাঁতী কাপড় দিয়ে চাল সংগ্রহ করতে থাকে। প্রথমে কেনা-বেচা চলতো জিনিস বদল করে। তারপর মুদ্রা বা টাকার প্রচলন হয়। তারা বুঝতে শেখে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়ে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করলে সুবিধে হয়। তাই সৃষ্টি হল বাজারের। বাজারে বিক্রীর জন্য বিভিন্ন জিনিস উৎপন্ন হওয়ায় পণ্য উৎপাদন' প্রথার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে। তার ফলে এই সব বাজারকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠে। এখানে কারিগররা বাস করতে থাকে। এইসব ব্যবসা-বাণিজ্য

শ্রম বিভাগ

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার

বাজারের উৎপত্তি

ও শিল্পের কেন্দ্রই আস্তে আস্তে শহরে পরিণত হয়। সাধারণতঃ স্থায়ী মনুষ্য বসতি, ধর্মস্থান, বিশুদ্ধ জলের প্রস্রবণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংযোগস্থল ইত্যাদি কেন্দ্রেই সেকালের শহর গড়ে উঠেছিল।

শহরের সৃষ্টি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এক একটা জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত করে তার নির্দেশ মেনে চলতে থাকে। নিজের নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে বিভিন্ন জাতি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিগুলোর উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে। অনেক সময় ছোট ছোট জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে একটি বড় জাতিতে পরিণত হয়। যুদ্ধে যারা বন্দী হতো প্রথম প্রথম তাদের মেরে ফেলা হতো। পরে তারা দেখলো যে, যদি এইসব বন্দীদের চাষের বা অন্যান্য কাজে লাগানো যায় তাহলে অনেক সুবিধে হয়। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দী হতো তাদের একটা সম্প্রদায় বা জাতির ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হতো। এমনিভাবে সমাজে দুটো শ্রেণীর সৃষ্টি হলো—প্রভু ও দাস। জমিজমা ও অন্যান্য জিনিসপত্রে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হবার পর সমাজে এমন এক শ্রেণীর জন্ম হল যারা খাওয়া পরার জন্য নিজেরা পরিশ্রমের ফলভোগ করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্ব শুরু হলো। তখন প্রয়োজন হলো শাসন ব্যবস্থার। তা না হলে সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। যারা সম্পত্তিবান তারাই ছিল সমাজের শক্তিশালী অংশ। তারা শাসক শ্রেণীতে পরিণত হলো। আর তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করলো। রাজা দেশ শাসন করতে থাকে। এভাবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলো। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র বলতে যে জটিল সংগঠন বোঝায় তার সূচনা দেখা যায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের নগরগুলির বিকাশে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, ভারত, মিশর, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশে প্রথম যুগের রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজে শ্রেণী সম্প্রদায়

রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎপত্তি

সিন্ধুনদের তীরে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োতে, টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উর, কিস, লাগাস প্রভৃতি স্থানে, নীলনদের তীরে মিশরে তাম্র-ব্রোঞ্জযুগীয় এবং চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে প্রাচীন চীনা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নদীর তীরে এই সভ্যতাগুলি গড়ে ওঠার কারণ কি? প্রথমতঃ জনসংখ্যা

বৃদ্ধির সঙ্গে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফসল ফলাতে হলে জলের দরকার। তাই নদী থেকে নালা কেটে জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করতে পারলেই চাষ আবাদ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া বন্যার পলিতে নদী-তীরবর্তী স্থানগুলি উর্বর হয়ে উঠে এবং ফসলও ফলে প্রচুর। দ্বিতীয়তঃ, জল না হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে না। নদী কাছে থাকলে সেখান থেকে সহজেই জল সংগ্রহ করা যায়। মানুষ বাঁচার তাগিদেই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করা পছন্দ করেছিল। তৃতীয়তঃ, সেই সময়ে দুর্গম স্থলপথে যাতায়াত ছিল বিপজ্জনক। সেই তুলনায় জলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ছিল অনেক বেশী সুবিধাজনক। কিন্তু নদীতীরে যদি নগরী না গড়ে ওঠে তবে তো আর জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ করা যায় না? সুতরাং বাণিজ্যও নদীতীরে সভ্যতা গড়ে তোলার পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

নদী-মাতৃক সভ্যতার বিকাশের কারণ

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) তাম্র ও ব্রোঞ্জ কিভাবে আবিষ্কৃত হয়? তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগ বলতে কি বোঝ? পাথরের তুলনায় তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের সুবিধা কি?

(২) তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের কৃষিজীবি ও পশুপালকের সম্বন্ধে কি জান?

(৩) কি কারণে বড় বড় নদীর ধারে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

(৪ শহর কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

(৫) কিভাবে বাজারের সৃষ্টি হলো? তার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের কি পরিবর্তন দেখা গেলো?

(৬) সমাজে কিভাবে শ্রেণীর আবির্ভাব হলো? কি কি কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব হলো?

(৭) কিভাবে রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল? তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ কর।

(৮) নদী মাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠবার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) কি কি ধাতুর মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী হয়?

(২) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কোথায় কোথায় মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল?

(৩) কাদের ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করা হতো?

(৪) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য দেখা দিল?

(৫) সর্বপ্রথম কোথায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে?

(৬) সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের অন্ততঃ তিনটি নদ বা নদীর নাম লেখ।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(১) — তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

(২) — ও — বড় বড় নদীর ধারে নতুন সমাজ দেখা দিতে লাগলো।

(৩) তাম্র-ব্রোঞ্জযুগে — ও — বাড়তি হলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না।

(৪) একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড় হয়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা করলে সুবিধা হয়। তাই সৃষ্টি হলো —।

(৫) শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর — শুরু হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব সভ্যতার আদি কেন্দ্র

এরই সময় যেমন সর্বত্র মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি তেমনি সব দেশে একই সঙ্গে সভ্যতারও বিকাশ ঘটেনি। মোটামুটিভাবে সারা পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চল জুড়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে বহু শতাব্দী কাল লেগেছিল। এখন থেকে প্রায় পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডে, ভারতের সিন্ধুনদের উপকূলে, মিশরের নীলনদের উপকূলে এবং চীনদেশের ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর উপকূলে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। এখানকার অঞ্চলকে বলা যেতে পারে সভ্যতার জন্মভূমি।

সভ্যতার প্রথম বিকাশ


প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল
গ্রীস
কৃষ্ণ সাগর
তুর্কী
অ্যাসিরিয়া
নিনেভে
ব্যাবিলন
সুমের
মধ্য এশিয়া
সিন্ধু নদ
হরপ্পা
মহেঞ্জোদরো
গঙ্গা
ভারতবর্ষ
আরব
আফ্রিকা
মিশর
নীল নদ
হোয়াংহো
ইয়াংসিকিয়াং
চীন
০ ৮০০ ১৬০০
কিলোমিটার
এসপিসি

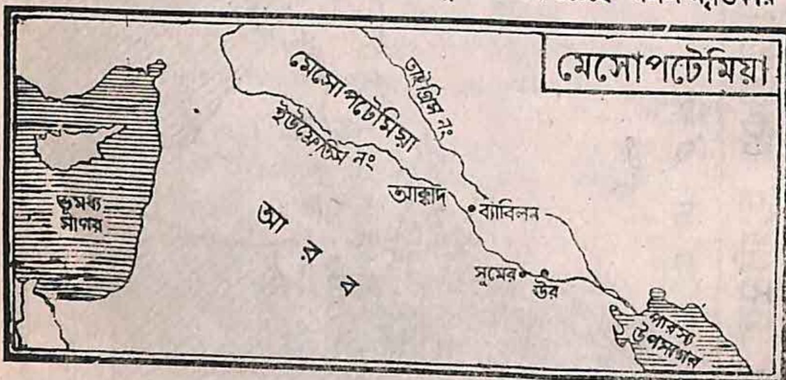
প্রথম পরিচ্ছেদ

মেসোপটেমিয়া

'মেসোপটেমিয়া' শব্দটির অর্থ হল 'দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড'। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস—এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত।

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

নদী দুটি উত্তর আর্মেনিয়ার পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। নদী দুটিতে বছরে প্রবল বন্যা হওয়ায় স্রোতের টানে পলি এসে জমেছে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, আর পারস্য উপসাগরের উপকূলে জেগে উঠেছে পালল মৃত্তিকায়



গঠিত ব-দ্বীপ। প্রতি বছর বন্যার ফলে পলি জমানোর ফলে এই অঞ্চল চিরউর্বর থাকে। নদী দু'টির মোহনার কাছে যে উর্বর ব-দ্বীপটি গড়ে উঠেছে, তার নাম সুমের। প্রাচীনকালে এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠে তাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা—এর জন্ম খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

এখানে অনেক বড় বড় প্রাচীন টিলা আছে, যেগুলো ছোটখাট পাহাড়ের মত দেখতে। এগুলোকে বলে টেল। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে মানুষ একই জায়গায় বসতি স্থাপন করায় এগুলি এমন উঁচু হয়ে উঠেছে। এক এক একটি টেল খুঁড়ে পর পর মাটির বিভিন্ন স্তরে ২০।২৫টি বসতি চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ঐ চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষগুলি তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের। সুমেরের নীপুর নামক নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় ৬৬ ফুট মাটির নীচে থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। 'উর' নামে সুমেরের অপর একটি নগরের ধ্বংসস্তূপে

টালির উপর খোদাই করা একটি প্রাচীন কবিতার কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে। ঐ নগরের একটি প্রাচীনতম কবরে সোনার পাত্র পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমানে বাগদাদের এক জাদুঘরে রাখা আছে।

মেসোপটেমিয়ার জমি চাষ আবাদের অত্যন্ত উপযোগী ছিল। আগেই জেনেছো, পারস্য সাগর থেকে জেগে উঠা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর পলি দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। প্রথমে ঐ অঞ্চল ছিল জলাভূমি, কিন্তু নদীর দু'পাশে ছিল বন্ধ্যা মরু প্রান্তর। সুতরাং ঐ অঞ্চলে প্রথমে যে সব মানুষ এসেছিল তারা জঙ্গল কেটে সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে জমিকে ফসল ফলাবার উপযুক্ত করে তুললো। এখানকার উর্বর জমিতে যে ফসলেরই চাষ করা হতো তার ফলন হতো প্রচুর। যব, গম, মটর, তিল, পেঁয়াজ প্রভৃতির চাষ এখানে হতো। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দলিল থেকে জানা যায়, যে পরিমাণ যবের বীজ বুনে দেওয়া হয়েছিল ফসল পাওয়া গিয়েছিল তার ৮৬ 'গুণ'। কাপড় চোপড় তৈরী করার জন্য শণ এবং আঁশযুক্ত গাছেরও চাষ করা হতো। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস লিখেছেন যে মেসোপটেমিয়ার চাষীরা জমি চাষ করে দু'শো গুণ ফসল ঘরে তুলতো।

মাটির উর্বরতা

এই মাটিতে একদিকে যেমন সহজেই চাষ আবাদ হতো অপরদিকে এগুলি রোদের চাপে শুকিয়ে অথবা আগুনে পুড়িয়ে তৈরী হতো ইঁট। কোনো এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হলে দুটি জিনিসের প্রয়োজন—প্রথমতঃ খাদ্য ও পানীয়, দ্বিতীয়তঃ বাসগৃহ তৈরীর উপকরণ। এ দু'টি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গড়ে উঠেছিল জনবসতি।

জমির উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সুমেরীয়দের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। বন্যায় বা জলের অভাবে ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য তারা বহু খাল কেটেছিল। এই খালগুলো বন্যার জল ধরে রাখতো এবং প্রয়োজনের সময় সেচের জল যোগাতো। প্রধানতঃ জমির আলের দিকে নজর রেখেই খালগুলির গভীরতা ঠিক করা হতো। এছাড়া বন্যার সময় নদীর জল যাতে তাদের শহর ও গ্রামগুলো ভাসিয়ে নিয়ে না যেতে পারে তার জন্য তারা বড় বড় বাঁধও নির্মাণ করতো। এইসব কাজের জন্য বহু মানুষের প্রয়োজন হতো। এইভাবে সকলের স্বার্থে পরস্পরের সাহায্যে সংগঠিত সমাজ গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

বন্যানিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

নদীমাতৃক সুমের সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষই কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকতো। পশুপালন অনেকের জীবিকা ছিল। বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিযুক্ত দক্ষ কারিগরের সংখ্যাও কম ছিল না। এদের মধ্যে ছিল কুমোর, যারা চাকা ঘুরিয়ে নানারকমের মাটির পাত্র তৈরী করতো। একদল শ্রমিক ইঁট তৈরী করতো আর ঐ ইঁট দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য একদল রাজমিস্ত্রী কাজ করতো। সুতো কেটে তা' থেকে পোষাক তৈরী করতো একদল। সুমেরীয়দের পশমের পোষাকের খুব খ্যাতি ছিল। বিভিন্ন বিভাগে চাকরীজীবির সংখ্যাও ছিল অনেক। বাঁধ পাহারা দেওয়া, বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্যও বহু সংখ্যক কর্মচারী ছিল।

বিভিন্ন বৃত্তি

বলদ আর গাধা টানার গাড়ী, নৌকো প্রভৃতি যানবাহন নির্মাণের কাজেও অনেকে নিযুক্ত ছিল। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরীর কৌশলও তারা জানতো। ফলে তামা ও টিন জোগাড় করার জন্য একদল মানুষ খনির কাজে লাগলো। আবার ঐ সব ধাতু গলিয়ে তা' থেকে নানা যন্ত্রপাতি ও ঘর গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরী করার জন্য একদল দক্ষ শিল্পীর সৃষ্টি হলো। ব্যবসায়ের মাধ্যমে বেশ কিছু লোক জীবিকা অর্জন করতো লাগলো। ব্যবসায়ীরা প্রচুর শস্য ও শিল্পদ্রব্য বিদেশে পাঠাতো। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে সুমেরীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। সুমেরে যেসব জনপদ ও নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যেও মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিবাদ বাঁধতো। এইভাবে একশ্রেণীর সৈনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।



সুমেরের পুরোহিত

প্রত্যেক নগরেই অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন। সকলেই দেবতাকে প্রসন্ন রাখার জন্য দেবতার প্রাপ্যরূপে নিজেদের উৎপাদনের একাংশ দিতো। ফলে দেবতাদের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে যেতো এবং দেবতার শস্য ভাণ্ডার জাতীয় শস্যভাণ্ডারে পরিণত হয়ে উঠতো। দেবতার অর্চনা, দেবতার সম্পদের তত্ত্বাবধান, মন্দির সংরক্ষণ প্রভৃতির কাজের জন্য একটি পুরোহিত শ্রেণী গড়ে উঠলো। পুরোহিতরা নানা দৈবী ও জাদু শক্তির অধিকারী বলে লোকে বিশ্বাস করতো। পুরোহিতদের মাধ্যমেই দেবত

তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এরূপ ধারণা ছিল মানুষের। তাই সমাজে পুরোহিতরাই ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শ্রেণী। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে বলা হতো পুরোহিতরাজ বা প্যাটেসি। পুরোহিত রাজার নির্দেশে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। শাসনব্যবস্থা পরিচালন করার জন্য এক শ্রেণীর রাজ কর্মচারী থাকতো।

পুরোহিতশ্রেণী

সুমের জাতি যে অঞ্চলটিতে বসবাস করতো তা' ছিল কয়েকটা নগর রাষ্ট্রের সমষ্টি। এক একটা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক একটা পৃথক রাষ্ট্র। এইসব রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা ছিল পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের হাতে। এদের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী কালক্রমে তিনিই পরিচালনা করতেন শাসনক্ষমতা। এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রনায়ক রাজা নামে পরিচিত হতেন। অনেক সময় রাজা ও পুরোহিত এক ব্যক্তিই হতেন। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের বিরোধ ঘটলে যুদ্ধ বাধতো। আবার পাশের মরু অঞ্চলের দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেও অভ্যস্ত ছিল।

সুমেরজাতির কৃতিত্ব : শাসন-ব্যবস্থা

হরফ আবিষ্কার সুমেরীয়দের আর একটি বড় কৃতিত্ব। প্রথম দিকে তারা ছবি এঁকে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যে ছবির সাহায্যে সব ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তখন তারা কতকগুলি ইংরেজী ৲-এর মত সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করলো। নরম মাটির টালিতে খাগের কলম দিয়ে লেখা বলে এই লিপিকে কীলকলিপি বা কিউনিফর্ম লিপি বলা হয়। এই মাটির টালি আগুনে পোড়ালে বা রোদে শুকোলে খুব শক্ত হয়। এই টালিগুলিতে রাজ্য শাসনের কথা, নানারকম দলিল, বিচারকের রায়, সম্পত্তির হিসাব, চিকিৎসা, গণিত, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা আছে।

লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার

সুমেরীয়দের সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি জিগগুরাট নির্মাণ। এই জিগগুরাটগুলি ছিল মন্দিরের উপর নির্মিত এক ধরণের মিনার। এই অঞ্চলে পাথর বা কাঠ সহজে পাওয়া যেতো না বলে কাঁচা আর পাকা ইঁট দিয়ে চারদিকে বেড় দিয়ে জিগগুরাটগুলো ধাপে ধাপে গেঁথে তোলা হতো। ওপরের দিকে কয়েকটার থাক থাকতো। একেবারে নীচে থাকতো ঢোকবার দরজা। সেখান থেকে ওপরে ওঠবার জন্য প্রায় একশোটি ধাপে তিনটে আলাদা সিঁড়ি থাকতো। উর নামে এক

মিনার নির্মাণ ও মন্দির পরিকল্পনা

জায়গায় মাটি খুঁড়ে ৭০০ ফুট বেড় দেওয়া প্রায় ৮০ ফুট উঁচু একটা জিগগুরাতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

মিনারশীর্ষের উপরে আবার গড়ে উঠতো মন্দির এবং সেই মন্দিরের প্রকোষ্ঠে বেদীর উপরে ছিল নগরীর শ্রেষ্ঠ দেব বা দেবীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ-কালে বা কোনো বিদ্রোহ ঘটলে জিগগুরাটের শীর্ষদেশ থেকে শত্রুদের উপর নজর রাখা হতো। মন্দিরগুলি রোদে-শুকানো ইঁট ও আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা হতো। মন্দির ও মিনারগুলিকে মজবুত করার জন্য মাটির পোড়া কীলক বা গোঁজ ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। ঐসব কীলকগুলি রঙিন দেখতে হওয়ায় মন্দিরের গা-গুলি বিচিত্র শোভা বর্ধন করতো। সুমেরের মন্দিরগুলোর দেওয়ালে নানা জীবজন্তু, বীরনায়ক ও দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা থাকতো। উর নগরের 'মানার' মন্দিরটির বাইরের দেওয়াল ছিল সবুজ রঙের টালি এবং ভেতরের দেওয়াল নানা ধাতুতে খচিত কাঠ দিয়ে মোড়া। মন্দির তৈরীর জন্য অনেক সময় যে সব পাথর ব্যবহার করা হতো সেগুলো অন্য দেশ থেকে আনতে হতো।



কীলক লিপির ক্রমবিকাশ

সুমেরের শিল্পীরা পাথর কেটে তাকে ঘষে ঘষে ইচ্ছেমত রূপ দিত পারতো। উরুকের মন্দিরে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পাথরের পাত্র। মনে হয় মন্দিরের নিজস্ব শিল্পীরা এগুলি তৈরী করেছে। একটি ৩ ফুট পাথরের পাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে ভাস্কর অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে এক শোভাযাত্রা।

প্রস্তর শিল্প

সুমেরীয়রা সোনা ও ব্রোঞ্জের অলংকার পরতো। এছাড়া তারা দুষ্প্রাপ্য রত্ন পাথরগুলিকে ছিদ্র করে নক্সা কেটে ব্যক্তিগত সীলমোহর রূপে ব্যবহার করতো। ফলে রত্নকার বা মণিকাররা

অলংকার শিল্প ও ধাতু শিল্প

অলংকার শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। আর একটা কথা, লোকে রত্নগুলিকে জাদুশক্তি সম্পন্ন বলে বিশ্বাস করতো।

সুমেরীয়রা ধাতু শিল্পে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা সোনা, রুপো সীসা প্রভৃতির ব্যবহার জানতো। সুমেরীয় সভ্যতার যুগের ধ্বংসাবশেষে দু'একটি লোহার তৈরী জিনিস পাওয়া গেলেও তখনও লোহার বিশেষ প্রচলন হয়নি। যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী হতো। তামা থাকে মাটির সঙ্গে মিশে। সুতরাং, তামাকে গলিয়ে মাটি থেকে আলাদা করার জন্য সুমেরীয়রা উন্নত ধরণের চুল্লী আবিষ্কার করেছিল।

সুমেরীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ উন্নত ছিল। তাদের ধনসম্পদের মূলে ছিল বাণিজ্য। তারা খাদ্য ও শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতো। আবার বিদেশ থেকে তারা সোনা, তামা, দামী রত্ন, কাঠ, বড় বড় ইমারত তৈরী করবার পাথরের চাঁই প্রভৃতি আমদানি করতো। রাজা ও শাসকগোষ্ঠীর পরিচালনায় বেচাকেনা চলতো। জলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের খুব প্রচলন ছিল না। কারণ নদীর স্রোতে উজানে নৌকা চালানো কঠিন ছিল। সেইজন্য গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে স্থলপথে জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি হতো। তামা আমদানি হতো ওমান থেকে। পূর্ব ইরানের অন্তর্ভুক্ত ড্রানজিয়ানা, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এমনকি ইউরোপের কোনা কোনো দেশ রপ্তানি করতো টিন। বাদাকশান থেকে ল্যাপিস-ল্যাজুলি, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মুক্তো, ভারত থেকে শঙ্খ প্রভৃতি মেসোপটেমিয়ার বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। মুদ্রার চল না থাকাতে পরিমাণমত যব, গম ও সোনা বা রুপোর বাটখারা দিয়ে ওজন করে জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা হতো।

ব্যবসা বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থা

সুমের অঞ্চলের কাছে আরব দেশ থেকে আগত আক্কাদ জাতির বসবাস ছিল। সুমের জাতির সঙ্গে আক্কাদ জাতির দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ ছিল। তাছাড়া সুমের ও আক্কাদের ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যের মধ্যেও বনিবনা ছিল না। এইসব কারণে অরাজকতা দেখা দেয়। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাবিলন রাজ্য সুমের ও আক্কাদের অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। সুমেরীয় শহরগুলোর পতন ঘটলেও এই অঞ্চলে সুমেরীয়দের ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত থাকে।

সুমের সভ্যতার পতন

প্রশ্নমালা

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এই অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

(২) 'টেল' কথাটির অর্থ কি? টেলগুলি থেকে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রাচীনতা কিভাবে জানা যায়?

(৩) সুমেরীয়রা চাষের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করে? তারা কিভাবে বন্যা প্রতিরোধ করে?

(৪) মেসোপটেমিয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্যের কারণগুলি উল্লেখ কর।

(৫) সুমেরের প্রাচীন মিনার ও মন্দির সম্বন্ধে যা জান বল।

(৬) মেসোপটেমিয়ার লিপিমালার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৭) সুমেরীয়দের ধাতু শিল্প ও অলংকার শিল্প সম্বন্ধে কি জান?

(৮) মেসোপটেমিয়ার লোকদের জীবিকা সম্বন্ধে কি জান?

(৯) সুমেরের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

(১০) সুমের সভ্যতার পতন হলো কিভাবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) মেসোপটেমিয়ার জমির উর্বরতার কারণ কি?

(২) কোথায় প্রথম মেসোপটেমীয় সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে?

(৩) জমির উর্বরতা সম্বন্ধে হেরোডটাস কি মন্তব্য করেন?

(৪) কিউনিফর্ম কথার অর্থ কি? এই চিহ্নগুলি দেখতে কেমন?

(৫) উর নগরের ধ্বংসস্তূপে কি কি পাওয়া গেছে?

(৬) 'জিগ্‌গুরাত' কি?

ঠিক উত্তরের নীচে √ এই চিহ্ন দাও :

(১) সভ্যতার আদিভূমি হ'ল মিশর/চীন/মেসোপটেমিয়া/সিন্ধু উপত্যকা

(২) সুমেরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে নব্য প্রস্তরযুগে/লৌহযোগে/তাম্র ব্রোঞ্জ যুগে

(৩) সুমেরের উঁচু মিনারকে বলা হতো জিগ্‌গুরাত/পিরামিড/গম্বুজ

(৪) সুমেরীয় লিপিকে বলা হয় হায়রোগ্লিফিক/কিউনিফর্ম/ব্রাহ্মী

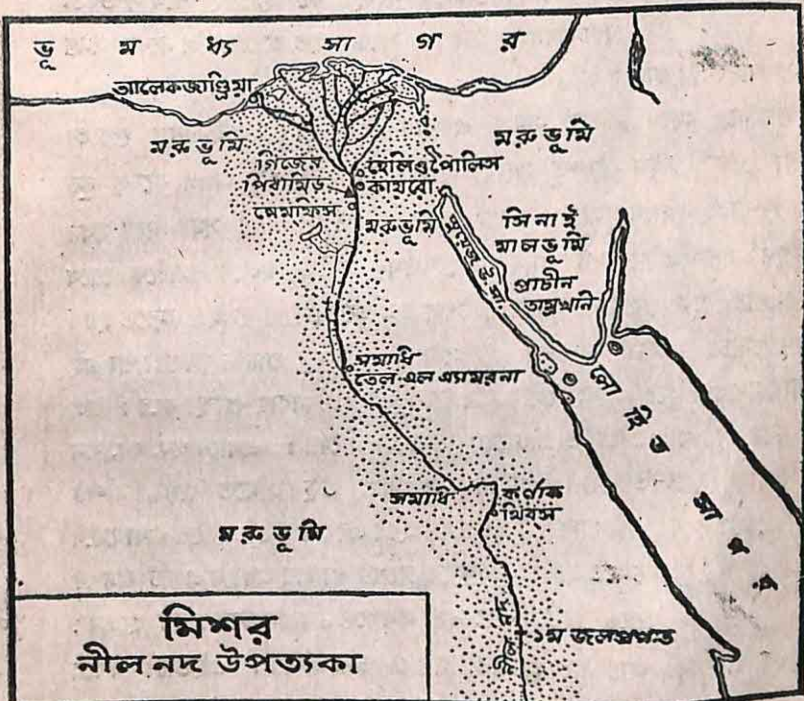
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশর

চাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের মত নীলনদের অববাহিকা অঞ্চল মিশরেও এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিশর-আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি দেশ। এর পূর্বে লোহিত সাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি।

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি

মিশরে এত কম বৃষ্টি হয় যে তার উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করা চলে না। কিন্তু অ্যাবিসিনিয়া পর্বতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই জল নীলনদে গিয়ে পড়ে। নীলনদ দৈর্ঘে প্রায় ৩000 মাইল। দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে



উত্তরে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। প্রতি বছর নীলনদে বন্যা হয়। ফলে মাটি নরম ও উর্বর থাকে। নীলনদের বয়ে আনা পলিতে মিশরের জমি হয়েছে উর্বর। ফলে মিশরে অফুরন্ত ফসল ফলে। এই নীলনদ যদি প্রবল বন্যায় তার উপকূলকে সুনির্দিষ্ট সময়ে প্লাবিত না করতো তা হলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। আবার নীলনদই হল একমাত্র নদীপথ যা মিশরকে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি দিয়েছে।

এইসব কারণেই ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে 'নীলনদের দান' আখ্যা দিয়েছেন। উন্নত জীবন যাপনের উপযোগী সব ক'টি উপাদান যেমন জলের প্রাচুর্য, জমির উর্বরতা ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মিশরে সহজলভ্য হওয়ায় মেসোপটেমিয়ার মত মিশরও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্ররূপে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

মিশরের মানুষ কোথা থেকে, কবে এসে বসতি স্থাপন করে, তা' সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে এখন থেকে ছ' সাত হাজার বছর আগেও এখানে যে তারা বসবাস করতো তাতে সন্দেহ নেই। যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড এশিয়া ও আফ্রিকাকে সংযুক্ত করেছে, সেই পথে সম্ভবতঃ তারা এখানে আসে। পরে আস্তে আস্তে নীল নদের সমগ্র উপত্যকায় তারা ছড়িয়ে পড়ে।

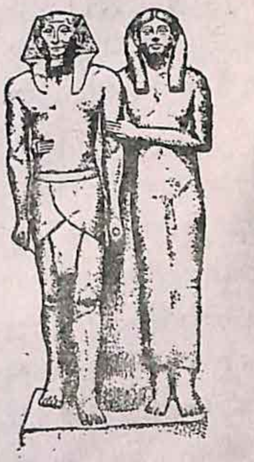
উপনিবেশকারীর মিলিত চেষ্টার ফলাফল

নীলনদে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে একবার বন্যা হয়। তাই বন্যা রোধের সমস্যা তেমন নেই। কিন্তু নদীর বুক থেকে তীরবর্তী অঞ্চল কয়েক ফুট উঁচু হওয়ায় এখানে সেচের সমস্যা আছে। তাই বন্যার সময় নদী যখন পরিপূর্ণ হয়ে তীরভূমিকে প্লাবিত করে তখন নদীর জলকে আটকে রেখে এবং নদীর বুক থেকে উপরে সুকৌশল জল তুলে সেচের ব্যবহার করতে হয়। এখানে সেচের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়রা এই সমস্যার সমাধান করে। বহু লোক বাঁধ দিয়ে জল আটকাবার ব্যবস্থা করে। জল সঞ্চয় করে আর খাল কেটে তারা চাষের জমিতে জল দেয়। এখানে গম, যব, শন ছিল প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। প্রাচীন মিশরীয়রা উঁচু জমিতে বাড়ী, মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে। মিলেমিশে কাজ করতে হলে একজন কর্তা ব্যক্তির কথা মেনে চলতে হয়। এইভাবে দেশের রাজার অধীনে একটি জনপদ গড়ে উঠে। প্রত্যেক জনপদে একজন করে রাজা ছিলেন; তাঁর ছিল রাজধানী আর রাজধানীতে ছিল দেবতার মন্দির। এইভাবে মিশরে খণ্ড খণ্ড প্রায় ৪০টি ছোট ছোট রাজ্য দেখা দেয়। কালক্রমে লোক বুঝতে পারে যে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ও নদীর জলকে ঠিকমত চাষের কাজে লাগাতে হলে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। প্রথমে উত্তর ও দক্ষিণে দুটো বড় মিলিত রাজ্য গড়ে উঠে। তারপর দক্ষিণ অংশের রাজা মেনেশ উত্তর অংশ জয় করে মেম্‌ফিসে রাজধানী স্থাপন করে মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এইভাবে মিশর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ও সম্পদে বড় হয়ে উঠে।

ঐক্যবদ্ধ মিশর

ফারাও শব্দের অর্থ যিনি বড় বাড়ীতে থাকেন। দক্ষিণ মিশরীয় রাজ্যের দেবতা ছিল শ্যেনপক্ষীর দেবতা এবং উত্তর মিশরীয় রাজ্যের দেবতা ছিল সর্পদেবতা। ফারাও উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মিলনের প্রতীক হওয়ায় শ্যেনপক্ষী ও সর্প উভয়েরই মূর্তি প্রতীক রূপে ধারণ করতেন। ফারাওরা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মিলনের প্রতীক রূপে একসঙ্গে দুটি মুকুট মাথায় পরতেন —দক্ষিণের প্রতীক সাদা মুকুট ও উত্তরের প্রতীক লাল মুকুট। বিশাল প্রাসাদ থেকে ফারাও রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক। ফারাও যখন তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিদর্শনে যেতেন তখন অভিজাত ব্যক্তিগণ প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করে তাঁকে আপ্যায়িত করতেন। প্রাচীন সভাসদদের নিয়ে গঠিত একটি প্রবীণ পরিষদ ছিল—যাদের কাজ ফারাওকে পরামর্শ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ফারাও পরিষদের বিনা পরামর্শেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মিশরীয় শাস্ত্রে বলা আছে যে ফারাও সূর্য দেবতা 'রা' এবং আমুনের সন্তান। এই পৃথিবীতে তিনি মানুষরূপী দেবতা। মৃত্যুর পরও তার জন্য গড়া হতো মন্দির। সেখানে অন্যান্য দেবতার মত ফারাওকে পূজো করা হতো। তিনি ছিলেন জীবন্ত দেবতা। তাঁর নির্দেশ পালন ও ইচ্ছাপূরণের জন্য দেশবাসী প্রাণ দিতেও কাতর হতোনা। ফারাওরা দেবতা বলে গণ্য হওয়ায় তাঁদের বংশ ছিল দেববংশ। ফলে, নিজের বংশের বাইরে তাঁদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। মিশরে তিনটি রাজবংশ কয়েক হাজার বছর ধরে রাজত্ব করে। কখনও উত্তর মিশর কখনও দক্ষিণ মিশর ঐক্যবদ্ধ মিশরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। ফলে কখনও উত্তর মিশরের, কখনওবা দক্ষিণ মিশরের রাজবংশীয় কর্মকর্তারা মিশরে রাজত্ব করতেন।

ফারাও



মিশরের রাজা ও রাণী

ফারাও-এর পর মিশরে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা পেতেন পুরোহিতশ্রেণী। পুরোহিতরা ফারাও-এর দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং তাঁরাই ফারাও-এর ধন, মান প্রাণ ও সমৃদ্ধির জন্য পূজো করতেন। দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ যেসব খাদ্যশস্য, ধনরত্ন, জমি জায়গা উৎসর্গ করতো

পুরোহিত

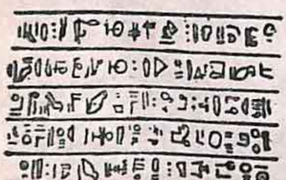
সেগুলি পুরোহিতদের হাতে যেতো। মন্দিরের পুরোহিতরা কেবল দেবার্চনা এবং দেবতার ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন না, তাঁরা ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। তাঁরা ছিলেন ভবিষ্যদ্‌বক্তা, চিকিৎসক ও শিক্ষক।

মিশরীয় পুরোহিতরা ১২ মাসে বছরের হিসেব চালু করেন। তাঁরা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অব্দ-গণনা প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৪১ অব্দ থেকে এই অব্দ গণনা শুরু হয়।

অনেক সময় পুরোহিত ছিলেন ফারাও-এর মন্ত্রী, কখনও খাজাঞ্চী, কখনওবা সেনাপতি। পুরোহিতরা ছিলেন খুব ধনী ও তাদের অনেক ক্রীতদাস ছিল। মোট কথা জ্ঞানে, ধনে, মানে পুরোহিতগণ মিশরে এক প্রভাবশালী সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হতেন।

প্রাচীন মিশরেই সর্বপ্রথম বর্ণমালার প্রচলন হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীদের মত প্রথমে মিশরীয়রা ছবির সাহায্যে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। ছবিগুলোকে অতি সংক্ষিপ্ত রেখার টানে সংকেতে বোঝাবার চেষ্টা থেকেই এই লিপির উৎপত্তি। পরে লিপিগুলি কেবল চিত্র সংকেতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকে ধ্বনির সংকেতরূপেও ব্যবহারের চেষ্টা হয়। এইসব লিপি মন্দিরের পুরোহিতরা বিশেষভাবে ব্যবহার করায় এগুলো হায়েরোগ্লিফিক বা দেবলিপি বা পবিত্রলিপি নামে পরিচিত হয়। নল খাগড়ার তৈরী কলম, প্যাপিরাস থেকে প্রস্তুত কাগজ, জল, গঁদ এবং ঝুল মেশানো কালির সাহায্যে বর্ণমালা পরপর সাজিয়ে লেখার কৌশল সর্বপ্রথম মিশরেই আবিষ্কৃত হয়।

লিপি



প্রাচীন মিশরের লিপি

প্যাপিরাস গাছের ছাল এবং তন্তুগুলি পরপর সাজিয়ে আঠার সাহায্যে একসঙ্গে গেঁথে রোদে শুকোনো হতো। এরপর এগুলো লেখার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এইসব লেখার বিষয়বস্তু ছিল সরকারী আদেশ, হিসেবপত্র, দলিল, নথি, বেসরকারী চিঠি, দেবদেবীর উদ্দ্যেশ্যে মন্ত্র, তন্ত্র ইত্যাদি। অনেকদিন পর্যন্ত হায়েরোগ্লিফিক পড়তে পারা যায়নি। কুড়ি বছর কঠোর পরিশ্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাম্পলিয় নামে এক ফরাসী ঐতিহাসিক এই লিপি পড়বার উপায়

বের করেন। ফলে কয়েক হাজার বছরের মিশরীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির কথা জানা যায়।

প্রাচীন মিশরে লিপিকলার চর্চা হতো গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। প্যাপিরাসের উপর লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ায় মিশরে সব বিষয়ে লেখার প্রচলন খুব বেড়ে গিয়েছিল। ফলে লিপিকাররা চাহিদা দেখা দিয়েছিল। মন্দিরে এবং প্রত্যেক সৈন্যদলে থাকতো আলাদা আলাদা লিপিকার। প্রত্যেক মন্দিরের লিপিকারগণ প্যাপিরাসের উপর ধর্মগ্রন্থ লিখতো। সৈন্যবাহিনীকে দেয় রেশনের পরিমাণ ঠিক করা, বিদেশে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সবই ছিল লিপিকারদের কাজ। লিপিকারদের রাজ্যের আর্থিক লেনদেনের হিসেব রাখতে হতো। এছাড়া প্রত্যেক জিনিসের দাম, ব্যবসার লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি লেখার দায়িত্ব ছিল লিপিকারদের উপর। বিক্রয়যোগ্য শস্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা, চুক্তিপত্র রচনা করা, প্রভুর আয়কর নিরূপণ করা প্রভৃতি নানা ধরণের কাজ লিপিকারদের করতে হতো। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে লিপিকারদের জীবন ছিল খুব পরিশ্রমের এবং একঘেয়েমিতে ভরা। কিন্তু তবুও তাদের জীবন ছিল সম্মানের এবং অনেক মিশরীয়ের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল লিপিকার হওয়া। এরাই ছিল তখনকার দিনের শিক্ষিত সম্প্রদায়।

লিপিকার

প্রাচীন মিশরের সমস্ত জমি ছিল ফারাও-এর সম্পত্তি। প্রজাপালন যেমন রাজার কর্তব্য, তেমনি প্রজার দায়িত্ব ছিল নির্ধারিত হারে খাজনার যোগান দেওয়া। প্রজাদের নাম-ধাম এবং বিষয়-সম্পত্তির তালিকা সরকারী দপ্তরে রাখা হতো। রাষ্ট্রের খাজনা আদায়ের জন্য "নোমাক" নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। তারা নিজের নিজের এলাকায় খাজনা আদায় করতো। যদিও তারা ছিল খুব পরাক্রমশালী তবুও ফারাওদের শক্তি ও দুর্বলতার উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্ভর করতো। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। তাই প্রজারা রাজকররূপে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের একাংশ দিতো। ঐসব উৎপন্ন দ্রব্য রাজ ভাণ্ডারে জমা হতো। রাজকর সংগ্রাহকরা রাজকর আদায় করতো ও তার হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখতো। মিশরের শাসন ব্যবস্থায় এদের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কর আদায়কারী কর্মীগণ

রাষ্ট্রের অপর এক শ্রেণী ছিল সৈনিক। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজার অধীনে থাকতো

সৈন্যদল। এরা অধিকাংশই ছিল পদাতিক বাহিনীর— কুঠার, বর্শা, ঢাল এদের প্রধান হাতিয়ার। পদাতিক ছাড়া রথারোহী সৈন্যদল ছিল মিশরের সামরিক বাহিনীর আর একটি অঙ্গ। ফারাও-এর দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী হিসেবে একদল সৈন্য সবসময়ই যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত থাকতো। দাস-মালিকদেরও সৈন্য থাকতো। তারা মালিকদের জমি জায়গা তদারক করতো এবং দাস ও চাষীদের উপর কড়া নজর রাখতো।

শ্রমিক কুল চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—চাষী, শিল্পী, মজুর ও ক্রীতদাস। চাষীদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। ফারাও সদয় হয়ে যাকে যা' জমি দিতেন সে-ই জমি চাষ করতো। এই মুক্ত চাষীরা নিজেদের জমি চাষ করা ছাড়াও জমিদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের চাষ ও সেচের কাজে নিযুক্ত থাকতো।

শ্রমিক বাহিনী

শিল্পী ও কারিগররা শহরে থেকে নানা কাজে নিযুক্ত থাকতো—নৌকা চালানো, ঘরবাড়ী ও নিত্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করা ইত্যাদি। এযুগের শিল্পীরা কামার, কুমোর, ছুতোর, স্বর্ণশিল্পী, মৃৎশিল্পী, চর্মশিল্পী প্রভৃতি সবলেই নিজের নিজের শিল্পের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার নজীর রেখে গেছেন। মজুরদের এক অংশ ছিল মুক্ত ও অপর অংশ ছিল ক্রীতদাস। কাজের বিনিময়ে মুক্ত মজুররা তাদের মজুরী পেতো। ক্রীতদাসরা অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবন্দী ও দণ্ডিত অপরাধী। অনাহারে মৃত্যুই ছিল তাদের চরম পরিণতি। মিশরের ফারাওরা প্রাসাদ, মন্দির, পিরামিড, পথঘাট প্রভৃতির নির্মাণ কাজে হাজার হাজার শ্রমিককে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিযুক্ত করতেন। রাজভাণ্ডার ও দেবভাণ্ডার থেকেই এরা নিয়মিত মজুরী পেতো।

মিশরে ব্যবসা ছিল বংশানুক্রমিক বৃত্তি। সমস্ত ব্যবসাই বিনিময়ের মাধ্যমে চলতো। অনেক সময় সোনা, রুপো ও মূল্যবান রত্নাদিও কেনাবেচার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হতো। স্থলপথে ব্যবসা চলতো গাধা বা ঘোড়ার পিঠে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে মিশরের বণিকরা সুদান এবং পাশের অঞ্চলে প্রত্যেক বছর তাদের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করতো। আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাদাকশান থেকে ল্যাপিস-ল্যাজুলি, লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলি থেকে রং-বেরঙের খোলক, লেবানন থেকে দামী কাঠ মিশরের বাজারে এসে পৌঁছোতো। আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হাতীর দাঁত, বিভিন্ন গন্ধ দ্রব্য, আবলুস কাঠ, জিরাফের চামড়া

প্রভৃতি জিনিসের ভাল বাজার ছিল মিশরে। মিশরীয়রা সিনাই থেকে তামা, নুবিয়া থেকে সোনা এবং আরব থেকে মসলা আমদানি করতো। সমুদ্রপথে বড় বড় জাহাজগুলি দাঁড় ও পালের সাহায্যে চলতো। তাদের বাণিজ্যতরী ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে যেতো।

পিরামিড প্রাচীন মিশরীয়দের এক অক্ষয় কীর্তি। 'পিরামিড' কথাটির অর্থ হলো 'উঁচু'। বড় বড় পাথরের চাঁই একটার পর আর একটা স্থাপন করে ক্রমশঃ সরু আকারে গড়ে তোলা হতো পিরামিড। সাধারণতঃ পিরামিড বলতে আমরা বুঝি পাথরে তৈরী ত্রিকোণাকৃতি বিরাট সমাধি-সৌধ। প্রাচীনযুগে মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো যে মৃত্যুর পরেও তার আত্মার বিনাশ হয় না—মৃত্যুর পর আত্মা আবার দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যতদিন দেহ অবিকৃত থাকবে ততদিন দেহধারীর আত্মা স্বর্গলোকে

পিরামিড

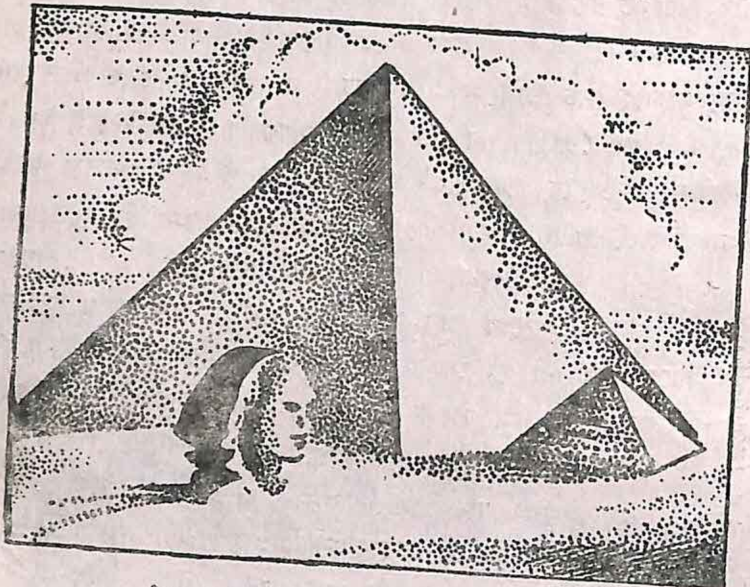
সুখে কাল অতিবাহিত করবে। এই কারণে মৃত ব্যক্তির দেহ যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য মানুষের দেহকে পরিষ্কার করে নানা ধরণের সুগন্ধ আরক ও মলম মাখিয়ে কাপড়ে জড়িয়ে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে সমাধি মন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থাপন করা হতো। এই দেহকে ম্যমি বলে। কাঠের বাক্সে ভরে সংরক্ষিত মৃতদেহ পিরামিডের ভেতরে কবর দেওয়া হতো। মিশরের পিরামিডগুলোতে এই রকম অনেক ম্যমি পাওয়া গিয়েছে। কলকাতার যাদুঘরেও মিশরের ম্যমি আছে। প্রকৃতপক্ষে পিরামিডগুলো ফারাওদের কবর। পিরামিডের ভেতরে একটা ঘরে মৃতদেহ যত্ন করে রাখা হতো এবং তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য সহ মৃতের ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্র যেমন আসবাবপত্র, জামা-কাপড়, গন্ধদ্রব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সাজিয়ে রাখা হতো। নানা ধরণের দামী জিনিসপত্র থাকতো বলে কবরের মধ্যে ঢোকবার দরজা এমন কৌশলে নির্মাণ করা হতো যাতে সহজে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। তবুও অনেক কবর দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এখন থেকে ৪৫০০ বছর আগে খুফু নামে একজন ফারাও কায়রো শহরের



ম্যমি

কাছে গিজ নামে একটা জায়গায় সবচেয়ে বড় পিরামিড নির্মাণ করেন। এই পিরামিডটি ৫০০ ফুট উঁচু। প্রায় একলক্ষ লোক কুড়ি বছর পরিশ্রম

করে এই বিরাট সমাধি মন্দির নির্মাণ করে। এটি মহাপিরামিড নামে পরিচিত। এটি তৈরী করতে প্রায় আড়াই টন ওজনের তেইশ লক্ষ পাথরের টুকরো লেগেছে। পাথরগুলি এমন নিখুঁতভাবে বসানো হয়েছে যে দুটি পাথরের মধ্যে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগও ফাঁক নেই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের রাজা



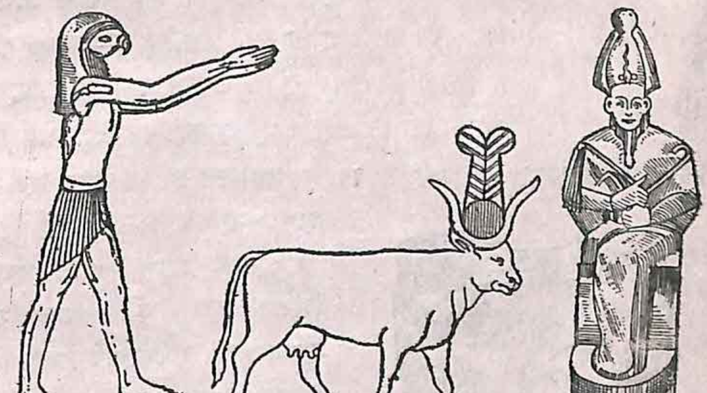
গিজেতে অবস্থিত খুফু নির্মিত মহাপিরামিড

টুটেনখামনের কবর খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এই কবরের মধ্যে খাট, চেয়ার, টুল সুন্দর সুন্দর পাত্র, জমকালো পোষাক ইত্যাদি বহু দ্রব্য বের হয়েছে। এইসব জিনিস দেখে আমরা মিশরের ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক ও প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

এক একটা পিরামিড নির্মাণ করতে দেশের প্রচুর সম্পদ ব্যয় হতো। বলা বাহুল্য পিরামিডগুলো প্রাচীন মিশরীয়দের গঠন প্রতিভার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন! এইসব পিরামিডের নিচেকার কক্ষে ফারাওদের ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিস এবং বিপুল ধনরত্ন রাখা হতো। পরবর্তীকালে ঐসব ধনরত্ন ও মহামূল্যবান বস্তু সামগ্রী সবই চুরি হয়ে গেছে। পিরামিডসমূহের বিশালত্ব ও স্থায়িত্বের ফলে আরবদের মধ্যে একটি কথার প্রচলন হয়—'জগত কালকে ভয় করে, কিন্তু কাল ভয় করে পিরামিডকে।' দেখতে সুন্দর না হলেও পিরামিডের বিশেষত্ব ও গাম্ভীর্য্য সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো সে মানুষ মরে গেলে পর তার আত্মা জীবিত থাকে। যতদিন পর্যন্ত মৃতদেহকে রক্ষা করা হয় তার জন্য খাদ্য ও পানীয় রাখা হয়, ততদিন পর্যন্ত সেই আত্মা দেহে বাস করতে থাকে। মৃত্যুর পরে মৃতদেহ ম্যমি করে রাখা এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয়। প্রাচীন মিশরীয়রা দেবদেবীর পুজো করতো। বিশাল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাভীরূপী দেবী হাথর। দেবী হাথরের পায়ের নীচে আকাশ এবং তার পেট দশ লক্ষ তারকা খচিত। শক্তিমান সূর্য দেবতা 'রা' তাঁর রশ্মি দিয়ে পৃথিবীকে উর্বর করে তোলেন ; প্রতিদিন সকালে উঠে দিব্য যানে চড়ে তিনি আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গমন করেন। জন্তু জানোয়ারের পুজোও মিশরীয়দের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কারণ তারা মনে করতো যে বিভিন্ন দেবদেবী তাদের প্রিয় জন্তু জানোয়ারের দেহ ধারণ করে থাকেন। যেমন 'রা' ধারণ করে থাকেন

ধর্ম-বিশ্বাস



মিশরের দেবদেবী

বৃষ অথবা গঙ্গাফড়িং-এর রূপ। 'রা'-এর পুজো বদ্বীপ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মিশরবাসী সূর্যকে বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে পুজো করতো। এছাড়া মিশরবাসীরা কোনো কোনো দেবতাকে কল্পনা করেছে বিড়াল রূপে আবার বা কাকেও কুমীর রূপে আবার কাকেওবা শৃগাল রূপে। উদ্ভিদের মধ্যে খেজুর গাছকেও দেবতা-জ্ঞানে পুজো করা হতো। এছাড়াও মিশরীয়দের চোখে আরেকজন শক্তিমান দেবতা ছিলেন ওসিরিস, যিনি জীবন ও মৃত্যুর দেবতা। তিনি মৃত্যুর পর মানুষের কর্মধারার বিচার করে তাকে যোগ্য পুরস্কার বা শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ওসিরিসের আসন ছিল এবিডিস নগরে। দেবতা ওসিরিসের স্ত্রী ছিলেন 'আইসিস'। তিনি ছিলেন শক্তিরূপিণী। কৃষির রক্ষাকর্তা ও নীলনদরূপী ওসিরিস ও আইসিসের স্পর্শে মিশরের মাটি হয়ে উঠে উর্বর। তাঁদের সন্তানের নাম 'হোরাস'। এছাড়া 'টা' ছিলেন কারুশিল্পের দেবতা। টা-এর মন্দির ছিল মেম্‌ফিস-এ। 'আমন' ছিলেন প্রাচীন মিশরীয়দের বাস্তু দেবতা, পরে যুদ্ধের দেবতা। মিশরীয়রা বহু দেবদেবীর কল্পনা করেছিল এবং তাদের ঘিরে বহু কাহিনী গড়ে উঠেছিল।

মিশরে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ফারাওরা মন্দির তৈরী করার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। পাথরের তৈরী এইসব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখলে বোঝা যায় মিশরীয়রা স্থাপত্য শিল্পে কি বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল!

নীলনদীর পলি দিয়ে তৈরী মিশর ছিল খুবই উর্বর। সেই সব জমির মালিক ছিলেন ফারাও। তিনি সদয় হয়ে যাকে যা জমি দিতেন সে-ই জমি চাষ করতো। নীলনদে যখন বন্যা হতো তখন কিছুদিন কৃষিকাজের সুযোগ থাকতো না। তখন স্থপতি ও নির্মাণ শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত হতো। এছাড়া মূর্তি নির্মাণেও বহু লোক নিযুক্ত থাকতো। ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পে মিশর যে কত উন্নত ছিল তা ঐ দুর্গের মূর্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। বয়ন শিল্পে মিশরীরা ছিল খুব উন্নত। তুলো ও পশমের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও পোশাক তারা তৈরী করতো। দেশের মৃৎশিল্পীরাও নানা রঙের সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র নির্মাণ করতো। মৃৎপাত্রগুলি গঠন সুষমায় কেবল সুন্দর ছিল না, সেগুলিছিল বিচিত্র বর্ণের এবং নানা রকমের চিত্রে পূর্ণ। মণিকারের কাজেও মিশরীয়রা খুব দক্ষ ছিল। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত প্রভৃতির বহু সৌখিন জিনিস ও অলংকার তারা তৈরী করতো। মিশরীয়রা সম্ভবতঃ কাচ ও কাচ শিল্প

প্রধান জীবিকা



মিশরের ভাস্কর্যের নমুনা

আবিস্কার করেছিল। একদল শ্রমিক ইঁট, প্লাস্টার অফ প্যারিস প্রভৃতি প্রস্তুত করায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। নৌ-চালনায় ও নৌ-বাণিজ্যে বহুলোক নিযুক্ত থাকতো। মিশরীয়া যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। বহু মিশরীয় যোদ্ধার বৃত্তি নিতো। এছাড়া একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তরোয়াল, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি তৈরী, করতো। হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখার কাজেও বহুলোক নিযুক্ত থাকতো। লিপিকারের কাজ মিশরে যথেষ্ট মর্যাদা পেতো; মন্দিরে দাসদাসীর ও পরিচারক পরিচারিকার কাজে বহুলোক নিযুক্ত থাকতো। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা অধিকাংশই ছিল স্বাধীন, অল্প কিছু সংখ্যক ক্রীতদাসও নানা কাজে নিযুক্ত থাকতো। বৃত্তিগুলি ছিল পরম্পরানুক্রমিক। শ্রমিকেরা অনেক সময়ই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতো। পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসক হিসেবে মিশরে ইম্‌হোটেপ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। প্রাচীন মিশরে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে চর্চা হতো। মিশরীয় পণ্ডিতেরা ২৪ ঘণ্টায় দিন ৩০ দিনে মাস ও ৩৬৫ দিনে বছর ভাগ করেন। তাঁরা রাশিচক্র ও আকাশের বিভিন্ন তারা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। মিশরীয়দের পাটিগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত জ্ঞানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের জ্যামিতি জ্ঞান বেশ প্রখর ছিল। গ্রীকরা পরে মিশরীয়দের কাছ থেকে গণিতবিদ্যা আয়ত্ত করে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

(১) মিশর কোথায়? মিশরকে নীলনদের দান বলে কেন?

(২) 'ফারাও' শব্দের অর্থ কি? ফারাও সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(৩) পুরোহিতরা কি কি কাজ করতো? তাদের প্রচুর আয় হতো কিভাবে?

(৪) প্যাপিরাস কি? মিশরের প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(৫) মিশরের লিপিকারদের কাজ কি ছিল?

(৬) মিশরের কৃষকেরা ও কারিগররা যে সব জিনিস উৎপন্ন করতো—সে বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

(৭) ম্যামি কি? কেন ম্যমি তৈরী করা হতো?

(৮) সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরী করেন কে? কিভাবে এই পিরামিডটি তৈরী হয়েছিল?

(৯) মিশরের দেবদেবী ও মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(১০) প্রাচীন মিশরের প্রধান জীবিকা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) মিশরকে 'নীলনদের' দান কে বলেছেন?

(২) হায়েরোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেন কে?

(৩) দেবতা ওসিরিস-এর স্ত্রীর নাম কি? তাঁদের সন্তানের নাম কি?

(৪) মিশরের প্রাচীন লিপিকে ইংরাজীতে কি বলে?

(৫) সবচেয়ে বড় পিরামিডটি কোথায় আছে? কে নির্মাণ করেন?

(৬) কারুশিল্পের দেবতা কে? তাঁর মন্দির কোথায়?

(৭) মিশরে অব্দ গণনা সর্বপ্রথম কারা আরম্ভ করেছিল? কবে থেকে মিশরে অব্দ গণনা শুরু হয়?

(৮) প্রাচীন মিশরীয়রা কিসের উপর লিখতো?

ঠিক উত্তরের নীচে ✓ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) মিশরের জমির উর্বরতার কারণ হল বৃষ্টিপাতের ফলে/সার প্রয়োগের দরুণ/নীলনদের বন্যায় পলি সঞ্চয়ের ফলে।

(খ) পিরামিড হল মন্দির/সমাধি/রাজপ্রাসাদ।

(গ) মিশরের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফারাও/পুরোহিত/লিপিকার।

(ঘ) মিশরীয়দের জীবন ও মৃত্যুর দেবতা ছিলেন টা/ওসিরিস/রা।

(ঙ) মিশরীয় লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন ঐতিহাসিক হেরোডটাস/মার্টিমার হুইলার/শাম্পলিয়ঁ।

———

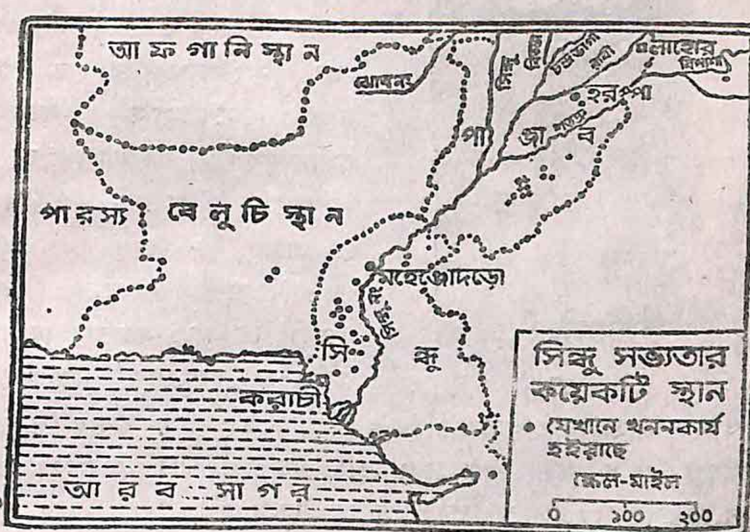
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু সভ্যতা

ভারতের উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু নদ। এই সিন্ধুনদের উপত্যকায় মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মত তাম্রব্রোঞ্জ যুগের এক নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-নদের জলধারাকে কেন্দ্র করে সিন্ধুসভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

সূচনা

এই সিন্ধুসভ্যতাই হলো ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা বৈদিক যুগের আগে গড়ে উঠেছিল বলে একে প্রাক বৈদিক সভ্যতা নামেও অভিহিত করা যায়।



সিন্ধু দেশের লারকান জেলায় মহেঞ্জোদড়ো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা নামে দুটি স্থানে বহু ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হওয়ার ফলে এই সভ্যতার কথা জানা গিয়েছে। সিন্ধু নদের পশ্চিমতীরে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা অনেকটা উত্তরে অবস্থিত। দেশ ভাগ হয়ে যাবার ফলে এই দুই জায়গা এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। সিন্ধী ভাষায় মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ 'মৃতের সমাধি বা স্তূপ'।

অবস্থান ও আবিস্কারের কথা

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কার করেন। সেই বছরই দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় ঐ রকম ভগ্নাবশেষ আবিস্কার করেন। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার

জন মার্শালের চেষ্টায় এই দু'জায়গায় ব্যাপক খনন কার্য শুরু করা হয়। তার ফলে লুপ্ত এক সভ্যতার কথা জানা যায়। মাটির গভীর স্তর খুঁড়ে যে সব চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে তার সাহায্যে আমরা সেই ভুলে যাওয়া যুগের ছবি কল্পনা করতে পারি। প্রাচীনযুগের এইসব চিহ্নগুলির মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, মূর্তি, খেলনা, চিরুনি, সীলমোহর, ঘরবাড়ী, শহরের বহু স্মৃতিচিত্র প্রভৃতি।

বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সত্তরটিরও বেশী স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত। এই অববাহিকা অঞ্চলের বাইরে মাকরান উপকূলের কয়েকটা স্থানে এমনকি পাকিস্তান ও পারস্য সীমান্তের কাছে সুৎকাজেন-দোরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান ভারতে রাজস্থানের কালিবাঙ্গানে ও ক্যাম্বে উপসাগরের কাছে লোথালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাটি খুঁড়ে সিন্ধু সভ্যতার মত একটি সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা ছাড়াও বেলুচিস্থান থেকে রাজস্থান এবং পাঞ্জাব থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাম্র ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। অনেকে মনে করেন, এই সভ্যতা খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।



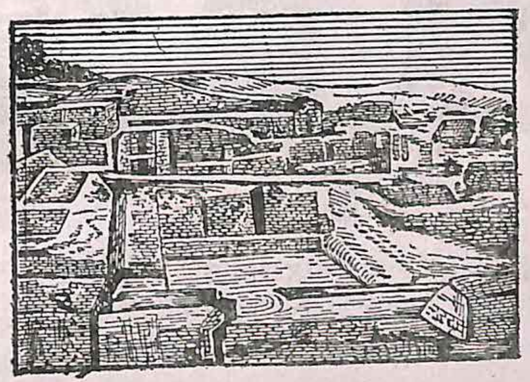
পয়ঃপ্রণালী

সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। নাগরিক সভ্যতার এরকম বিকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। নগর দু'টির পরিকল্পনা সুচিন্তিত উপায়ে বেশ সুন্দরভাবেই করা হয়েছিল। নগর দু'টি ছিল জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী।

নগর পরিকল্পনা

নাগরিকদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যাবতীয় ব্যবস্থা নগর দুটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নগরের সদর রাস্তাগুলি ছিল বেশ চওড়া ও দীর্ঘ। বাড়ীগুলিতে সমান দূরত্বের ব্যবধানে আলোকস্তম্ভ ছিল। ঘরবাড়ীগুলি ছিল পাকা ইঁটের তৈরী; কোনো কোনো বাড়ী ছিল দোতলা। উপরের তলায় বাস করতেন বাড়ীর মালিক ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। নীচের

তলায় ছিল চাকরদের ঘর, রান্নার জায়গা ইত্যাদি। ধনীদের ঘরবাড়ীর আয়তন ছিল বেশ বড় ; গরীব শ্রমজীবীরা বাস করতো ছোট ছোট ঘরে। ধনীদের বাড়ীতে থাকতো প্রশস্ত দরজা জানালা, উঠান, স্নানের জায়গা, শৌচাগার, ছাদ থেকে বৃষ্টির জল নিকাশের নর্দমা প্রভৃতি। বাড়ীর ভেতর থেকে নল বা নালা দিয়ে জল বের করে সদর রাস্তার বড় বড় নর্দমায় সেই জল ফেলার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীর জঞ্জাল ফেলার জন্য রাস্তায় বড় বড় আবর্জনা-কুণ্ড থাকতো। রাজপথের উপর বড় বড় বাড়ীর নীচের তলায় দোকান এবং পাশের গলি দিয়ে বাড়ীর প্রবেশপথ রাখা হয়েছিল। মহেঞ্জোদড়োতে সবচেয়ে বড় বাড়ী যা আবিস্কৃত হয়েছে তার আয়তন হল লম্বায় ২৩০ ফুট এবং চওড়ায় ৭৮ ফুট। হরপ্পায় একটা বিরাট শস্য ভাণ্ডার আবিস্কৃত হয়েছে যা ১৫০ ফুট × ২০০



সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো।

ফুট একটা উচ্চ মঞ্চের উপর তৈরী। হয়ত কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত শস্য জমা রাখা হতো এখানে। মহেঞ্জোদড়োতেও অনুরূপ শস্যাগারের অস্তিত্ব ছিল। মহেঞ্জোদড়োয় যে বিরাট স্নানাগারটি আবিস্কৃত হয়েছে সেটি লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওড়ায় ১০৮ ফুট। এর চারদিকে ছিল ৮ফুট পুরু দেওয়াল। স্নানাগারের মধ্যে ছিল ৩৯ ফুট লম্বা ও ২৩ ফুট চওড়া, ৮ ফুট গভীর একটা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চায় নামার জন্য আটটি সিঁড়ি ভাঙ্গতে হতো। চৌবাচ্চাটির তলা বেশ শক্ত করে বাঁধানো। চৌবাচ্চার চারদিকে গ্যালারির মতো বসবার জায়গা এবং বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য কক্ষ ছিল। গ্যালারির পেছনে বহু কামরা ছিল এবং কামরার ভেতরে কূপ ছিল। কূপ থেকে চৌবাচ্চায় জল ভরা হতো। চৌবাচ্চাটিতে সম্ভবতঃ স্নান ও সাঁতার দুই-ই হতো।

চৌবাচ্চাটি নল দ্বারা সিন্ধু নদের সঙ্গে যোগ থাকায় প্রয়োজনে এটি জলপূর্ণ এবং সেই জল নিষ্কাশিত করারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

শস্যভাণ্ডারের নিদর্শন দেখে ধারণা হয় যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা কৃষিকাজ জানতো। অবশ্য চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল কিনা তা জানা যায়নি। যাই হোক তাদের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল গম, যব, বার্লি ও নানা ধরণের বাদাম। মাছ ধরার জন্য অনেক বঁড়শি পাওয়ার ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা হয় যে মাছ ছিল তাদের অন্যতম খাদ্য। এছাড়া গরু, শূকর, মেষ, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাদের

খাদ্য



হরপ্পায় প্রাপ্ত মাটির পাত্র

প্রিয় ছিল। এছাড়া ডিম, দুধ ও নানা ধরণের ফলের মধ্যে তরমুজ, খেজুর প্রভৃতি তারা খাদ্য রূপে ব্যবহার করতো। তবে ধানের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কুমোরের চাকাতে গড়া বড় বড় মাটির জালায় খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হতো।

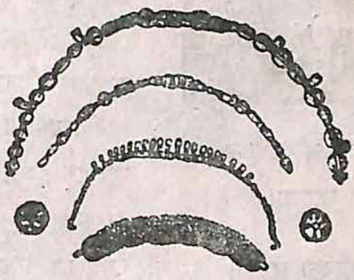
এখানকার লোকে তুলো ও পশমের কাপড় বুনতো এবং সুতী ও পশমের পোষাক ব্যবহার করতো। হাতির দাঁতের তৈরী সূঁচ, মাটি, চীনামাটি ও হাড়ের মাকু ও ক্যাটিম পাওয়া গেছে। ঐগুলি নিশ্চয়ই বোনা ও সেলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো। তখনকার সমাজে কুমোর, তাঁতী, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি বৃত্তিধারী বহু লোক ছিল। কুমোররা চাকার সাহায্যে মাটির জালা, কলসী, থালা, গেলাস, বাটি প্রভৃতি বাসনপত্র তৈরী করতো। সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে মজবুত করা হতো। পরে নানারকমের রঙ দিয়ে জিনিসগুলোকে চিত্রিত করা হতো। মাটির তৈরী নানা রকমের খেলনা, পুতুল, পাখীর আকারের বাঁশী, দেবদেবীর মূর্তি ও বাঁদরের মূর্তি ইত্যাদি তারা তৈরী করতো। আগুনে পুড়িয়ে ইঁট তৈরী করে তা দিয়ে বড় বড় দালান তৈরী করতে এখানকার কারিগররা বেশ দক্ষ ছিল।

নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী

কাদা, বালিমাটি ও খড়ি মাটির মশলা দিয়ে ইঁটগুলি গাঁথা হতো। মাটি ছাড়া আর যে সব ধাতুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র তৈরী হতো তার মধ্যে ছিল তামা, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি, রুপো। এছাড়া হাতির দাঁতের চিরুনী, তামা ও ব্রোঞ্জের কাস্তে, মাছ ধরার বঁড়শি, ক্ষুর ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল। তখন পাশা খেলার প্রচলন ছিল। সেযুগে যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কুঠার, গদা, ছোরা, বর্শা, করাত প্রভৃতি। অস্ত্রগুলো তামা কিংবা ব্রোঞ্জে তৈরী হতো। কিন্তু কোথাও লোহার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা যায়নি। তাই মনে হয় যে এই সভ্যতা প্রাক লৌহযুগের।

শিল্প

সোনা, রুপো ও তামার অলংকার স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নারীদের প্রধান অলংকার ছিল কোমরবন্ধ, পায়ের নূপুর, কানপাশা ও গলার হার। নানা রকম অলংকার তৈরী হতো ল্যাপিস-ল্যাজুলি, স্ফটিক, নীলকান্তমণি প্রভৃতি দামী পাথর দিয়ে। নারীরা পরিপাটি করে চুল বাঁধতে জানতো। প্রধান সামগ্রীর ব্যবহারও অজ্ঞাত ছিল না। হাতীর দাঁত, চীনামাটি, শাঁখ, ঝিনুকের তৈরী বহু সৌখিন জিনিসও তারা ব্যবহার করতো। সীলমোহরের উপর অঙ্কিত জীবজন্তুর ছবিগুলি সেযুগের চিত্রশিল্পীদের প্রতিভার পরিচয় দেয়।


অলংকার (মহেঞ্জোদড়ো)

মাটির খেলনাগুলি থেকে ঐ সময়ের সামাজিক অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মাটির তৈরী খেলনা গরুর গাড়ী ও চেয়ার দেখে বোঝা যায় যে চেয়ার ও গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হতো। নাচার ভঙ্গিতে তৈরী পুতুল দেখে জানা যায় যে এখানকার মেয়েরা চুল ঘাড়ের উপর ফেলতো এবং নাচতে জানতো। মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া বড় মূর্তি দেখে বোঝা যায় যে এখানকার লোকেরা দামী আলোয়ানের ব্যবহার জানতো। এছাড়া আরও জানা যায় যে তারা দাড়ি রাখতো, কিন্তু ঠোঁটের উপরের চুল কামিয়ে ফেলতো।

খেলনা

সিন্ধু অঞ্চলে উট ও হাতির হাড় ও কঙ্কাল পাওয়ার ফলে মনে হয় যে উট ও হাতি নিশ্চয় পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। সিন্ধু অঞ্চলে বহু নদনদী

থাকায় এবং আরব সমুদ্র কাছে হওয়ায় লোকে নিশ্চয়ই নৌ-চালনা জানতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য

নদীপথে ও সমুদ্র পথে সম্ভবতঃ তারা ব্যবসা বাণিজ্য করতো। মিশর, বেলুচিস্তান, সুমেরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে সিন্ধুর বণিকেরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাতায়াত করতো। স্থলপথে নিরেট চাকাওয়ালা গরুর গাড়ীতে করে এবং উটের পিঠে চাপিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্য চলাচল করতো। পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে আসতো তামার তাল, রুপো, নানারঙের দামী পাথর। গুজরাটের কাথিয়াবাড় এবং দাক্ষিণাত্য থেকে আসতো বিচিত্র সব শাঁখ। হস্তশিল্পীদের তৈরী পণ্যসম্ভার যেতো বেলুচিস্তানের গ্রামগুলিতে। জলপথে বা স্থলপথে ভারতীয় পণ্য মেসোপটেমিয়ায় পৌছোতো। সুমেরে যেহেতু সিন্ধু অঞ্চলের সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে সেহেতু অনেকে মনে করেন যে ব্যবসার প্রয়োজনে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ সুমেরে একটা বসতি গড়ে তুলেছিল। সিন্ধু উপত্যকায় কোনো মুদ্রার চল ছিলনা—বিনিময়ের মাধ্যমেই কেনাবেচা হতো। বেশীর ভাগ কেনাবেচা শস্যের মাধ্যমেই হতো। জিনিসপত্র ওজনের জন্য এখানে বাটখারার ব্যবহার ছিল ; সীলমোহরগুলি সম্ভবতঃ ব্যবসার প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হতো।



সীলমোহর
(মহেঞ্জোদড়ো)

সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে কোনো মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে মাটির তলা থেকে পাওয়া সীলমোহরের মধ্যে একটা দেবী মূর্তি দেখা গেছে যার তিনটি মুখ এবং মাথার দিকে দুটি শিং আছে। মূর্তিটির সঙ্গে কয়েকটি জীবজন্তুও আছে। অনেকে মনে করেন এই মূর্তিটি শিবের এবং

ধর্মবিশ্বাস

এখানে শিবপুজো প্রচলিত ছিল। এখানে একজন দেবীর খুব প্রতিপত্তি ছিল, তিনি খুব পুজো পেতেন। তাঁর নাম অম্বিকা। অনেকের ধারণা অম্বিকাদেবীর পুজো পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম শুরু হয়। এছাড়া পশুদের মধ্যে ষাঁড় এবং গাছের মধ্যে অশ্বত্থকে তারা উপাস্য বলে মনে করতো। কতকগুলি ব্রোঞ্জের নৃত্যরতা নারী মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে অনেকের ধারণা হয়—সেই সময় দেবদাসীও ছিল। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে লিঙ্গপুজো প্রচলিত ছিল। মৃতদেহকে দাহ করা ও কবর দেওয়া—দুই প্রথাই এখানে প্রচলিত ছিল।

যেসব বাসগৃহ এবং জিনিসপত্র মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে সিন্ধু অধিবাসীদের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। শস্যাগারে সংগৃহীত শস্য তার অর্থনৈতিক শক্তি প্রমাণ করে। সুষ্ঠু নগর, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির পরিকল্পনা শাসকের ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। এখানে নানা শ্রেণীর ও পেশার লোক বাস করতো—শাসক, সম্পত্তিবান, বিজ্ঞানী, পুরোহিত, প্রযুক্তিবিদ, সৈনিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ। তাছাড়া তাঁতী, কুমোর, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির বিশেষ ভূমিকা ছিল। এছাড়া পরিবহন ব্যবস্থাতেও অনেক লোক নিযুক্ত থাকতো। জমির ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেওয়ার ফলে এখানেও বহু ধনী কৃষক, ক্ষুদ্র চাষী ও জমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। কৃষির পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটায় কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তুলো ও পশমের সুতো কেটে তা দিয়ে তাঁতীরা বস্ত্র তৈরী করতো। তখনকার কারিগররা টাকু তৈরী করতে জানতো। কুমোরেরা চাকার সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরী করতো এবং গোলাকার চুল্লীতে ওগুলি পুড়িয়ে নিতো। এখানে রঙিন ও চিত্রিত বিশেষ ধরণের মাটির পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার কামারেরা সোনা, রুপো, তামা, পেতল, ব্রোঞ্জ, সীসা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানতো। এখানে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নগর নির্মাণ পদ্ধতি ও জীবনযাত্রা দেখে বোঝা যায় এখানকার অধিবাসিদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। সৈনিকদের দায়িত্ব ছিল দেশরক্ষা করা ও শান্তি বজায় রাখা। বাণিজ্য প্রসারের ফলে শস্য ও শিল্প দ্রব্য চালান দিয়ে একদল মানুষ প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় বড় বড় দালান কোঠার পাশাপাশি গরীবদের সাধারণ ঘরদোর কিংবা ধনীদের বাড়ীতে চাকরদের থাকার আলাদা ঘর এই ধনবৈষম্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে বর্তমান-কালের তুলনায় সিন্ধু উপত্যকার শ্রমিক ও কারিগররা অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতো এবং তারা তামার জিনিসপত্র ও সোনার অলংকার ব্যবহার করতো।

সমাজ



বিনা মজুরীতে বেগার প্রথার প্রচলন হয়ত ছিল ; কিন্তু দাসপ্রথা তখনও গড়ে উঠেনি।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। তবে ভূমিকম্প, সিন্ধুনদের জলপ্লাবন, অরণ্য ধ্বংসের ফলে মরু অঞ্চলের বিস্তার, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বলে মনে করা হয়। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না ; কিন্তু আর্য্যেরা তা' জানতো। লৌহঅস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী আর্য্যদের আক্রমণই এই সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান কারণ বলে অনুমিত হয়।

সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

১। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোথায় ? সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনতার প্রমাণ কি ?

২। সিন্ধু সভ্যতা কোন্ যুগে বিকাশ লাভ করেছিল ? মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ কে প্রথম আবিষ্কার করেন ?

৩। মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল ? মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। সিন্ধু অঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় যে যে জিনিস পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।

৫। সিন্ধু সভ্যতার যুগের ভারতীয়েরা যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত ছিল তার প্রমাণ কি ?

৬। সিন্ধু উপত্যকার লোকদের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। সিন্ধু উপত্যকার লোকদের সামাজিক জীবনধারার পরিচয় দাও।

৮। সিন্ধু উপত্যকার লোকদের শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা সম্বন্ধে যা' জান লেখ।

৯। সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১)। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত ?

(২)। মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ কি ?
(৩)। সিন্ধু সভ্যতার কারিগরা কোন্ কোন্ শিল্প পারদর্শী ছিল ?
(৪)। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের সীলমোহরগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয় ?
(৫)। 'সিন্ধু সভ্যতা' নাম হল কেন ?
(৬)। কোন্ স্থানে সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের একটি বাণিজ্য উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ?

সঠিক উত্তরের নীচে এই ✓ চিহ্ন দাও ঃ

(১) মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়/দয়ারাম সাহনি/হেরোডটাস।
(২) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নতুন প্রস্তর যুগে/লৌহযুগে/তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে।
(৩) সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা ব্যবসা করতো রোমের সঙ্গে/মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে/চীনের সঙ্গে।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব——অব্দে।
(খ) সিন্ধু সভ্যতা ছিল——কেন্দ্রীক সভ্যতা।
(গ) সিন্ধী ভাষায় মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ——।
(ঘ) ——ব্যবসায় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো।
(ঙ) সিন্ধু উপত্যকার শিবপূজো ও——দেবীর পূজো প্রচলিত ছিল।
(চ) সিন্ধু সভ্যতার লোকে——ব্যবহার জানতো না।
(ছ) অনেকের ধারণা——দেবীর পূজো পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম শুরু হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন চীন

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সিন্ধু নদ, মিশরের ক্ষেত্রে যেমন নীলনদ, মেসোপটেমিয়ার ক্ষেত্রে যেমন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটি, চীনদেশের

সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মূলে তেমনই রয়েছে হোয়াং-হো (অথবা পীতনদী) ও ইয়াংসিকিয়াং নদী দুটির প্রভাব। এই নদী দুটির উৎপত্তিস্থান পশ্চিমে তিব্বতের মালভূমি। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এই দুটি নদী প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। হোয়াংহো নদীর প্রবল বন্যায় ঘরবাড়ী ভেসে গেছে, কৃষিভূমি নষ্ট হয়েছে। এইজন্য চীনাদের কাছে হোয়াংহো নদী ছিল দুঃখের নদী। অপর নদী ইয়াংসিকিয়াংয়ে বন্যা হলও এই নদীর প্রায় সবটাই নাব্য এমন কি অনেকদূর পর্যন্ত বড় বড় জাহাজও যাতায়াত করে। চীনের আদিম সভ্যতার জন্ম এই নদী দুটির উপত্যকায়। এখানে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

নদীর প্রভাব

মিশরের মত চীনদেশ জুড়ে ছিল অনেকগুলে ছোট ছোট জনপদ। মিশরের মত চীনদেশেও ছবির সাহায্যে লেখার কাজ চলতো। কাঠ অথবা বাঁশের পাতলা স্তরের উপর বাঁশের কলমের সাহায্যে আঁচড় কেটে উপর থেকে নীচের দিকে চীনদেশের লোকেরা চিঠিপত্র, দলিল, পুঁথি ইত্যাদি লিখতো। পরপর দশটি বাঁশের পাতা লেখা হওয়ার পর তার মধ্যে ফুটো করে চামড়া দিয়ে বাঁধানোর পর নতুন লেখা শুরু হতো। এইভাবে পাতার পর পাতা সাজিয়ে লেখা হতো বিরাট বিরাট পুঁথি। চীনদেশে ধান ও জোয়ারের চাষ হতো। রেশমের কীট পালনের জন্য তুঁতের চাষ করা হতো। চীনেরা সুতী ও রেশমের কাপড় বুনতো। চীনামাটির তৈরী নানারকম জিনিসপত্র তারা তৈরী করতে জানতো। এছাড়া তারা ব্রোঞ্জেরও বাসন কোসন তৈরী করতো। চীনারা প্রাচীনকাল থেকেই ঘোড়ার ব্যবহার জানতো। চীনামেয়েরা শস্য ও বীজ সঞ্চয় করে রাখতো, সংসারের কাজ দেখা-শোনা করতো। এছাড়া রেশম কীট পালন, রেশম উৎপাদন এবং রেশম থেকে সুতো ও কাপড় তৈরীর কাজ মেয়েরা করতো। চীনারা নানা দেবদেবীকে বিশ্বাস করতো। তবে বৃষ্টির উপর তাদের সুখ সম্পদ নির্ভর করতো বলে সম্ভবতঃ তারা আকাশকে প্রধান দেবতা বলে মনে করতো। চীনের পুরাকাহিনী থেকে জানা যায়, প্যান-কু হলেন ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা ; তিনি আঠারো হাজার বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর দেহের মাংস হতে মাটি, হাড় হতে পাহাড়, রক্ত হতে নদী ও সাগর, চুল হতে গাছপালা, নিঃশ্বাস হতে বায়ু, গলার স্বর হতে বজ্র, ঘাম হতে বৃষ্টি, অশ্রু হতে শিশির,

প্রাচীন চীনের ইতিহাস

চীনের উপকথা

মাথার খুলি হতে আকাশ, গায়ের উকুন হতে মানুষ, ডান চোখ হতে চাঁদ আর বাঁ চোখ হতে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে প্যান-কু এক সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

চীনদেশের উপকথায় পাঁচজন রাজার নাম উল্লেখ রয়েছে। এই রাজারা চীনাদের সঙ্গীতশিল্প, চিত্রশিল্প, রেশমের বয়নশিল্প, মাছ শিকার করার কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দেন। এই রাজাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুন; তিনি হোয়াংহো নদীর বন্যা প্রতিরোধ করেন। তাঁর ইউ নামে একজন কর্মচারী ন'টি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি ন'টি পাহাড় কেটে ঐ ন'টি নদীর বন্যার জল জমিয়ে ন'টি সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি করেন। এছাড়া ইউ অনেকগুলি খাল খনন করেন। তার ফলে অনেক অনুর্বর অঞ্চলে ফসল জন্মাতো। এজন্য ইউ-এর প্রতি চীনারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, "ইউ না থাকলে আমরা মাছ হয়ে যেতাম।"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। চীনদেশের প্রাচীন সভ্যতা কোন্ কোন্ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল? এই নদীগুলি কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে প্রবাহিত?

২। "ইউ না থাকলে আমারা মাছ হয়ে যেতাম"—এ কথা কারা বলতো? কেন বলতো?

৩। চীনাদের ধর্ম সম্পর্কে কি জান?

৪। চীনাদের লিপি সম্বন্ধে কি জান?

৫। চীনদেশে প্রধানতঃ কি কি চাষ হতো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পীতনদী কোন্ নদীকে বলা হয়?

২। চীনারা তুঁতের চাষ করতো কেন?

৩। চীনের কিম্বদন্তী অনুসারে চীনে কে বন্যা প্রতিরোধ করেন?

৪। চীনারা আকাশের পুজো করতো কেন?

সঠিক অংশের নীচে √ এই চিহ্ন দাও ঃ

১। চীনা লিপি লেখা হয় উপর থেকে নীচে/বাঁদিক থেকে ডান দিকে।

২। চীনারা বিখ্যাত ছিল পশমের জন্য/রেশমের জন্য।

৩। চীন সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে/নতুন প্রস্তর যুগে।

৪। সুপ্রাচীনকাল থেকেই তারা ঘোড়ার/হাতির ব্যবহার জানতো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদী মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ এবং চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল তা আলোচনা করেছি। জলবায়ু ভেদে সবকটি দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এইকভাবে ঘটেছিল। এইসব স্থানগুলির যথেষ্ট ভৌগোলিক ব্যবধান থাকলেও সভ্যতাগুলির মধ্যে মিল ছিল প্রচুর। এই মিল বা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ধরণের ছিল, তা দেখা যাক্।

কৃষি ও পণ্য

এই সমাজ ছিল প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক। নদীমাতৃক অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর হওয়ার ফলে এই অঞ্চলগুলিতে জনবসতি অত্যন্ত ঘন ছিল। ভূমি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় অতি অল্প আয়াসেই খাদ্য শস্য উৎপন্ন হতো—প্রচুর খাদ্য শস্য উদ্বৃত্ত থাকতো। উদ্বৃত্ত শস্য ভাণ্ডারই ছিল জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদ অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির মানুষের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করতো। উদ্বৃত্ত শিল্প-সামগ্রী বিদেশে বিক্রী হতো আর বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের দেশে আসতো। মুদ্রার প্রচলন না থাকায় প্রথমে সমস্ত রকম ব্যবসা বাণিজ্য দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যমেই চলতো। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ক্রমেক্রমে বিনিময় প্রথার স্থানে মুদ্রার প্রচলন ঘটে।

পরিবহন ব্যবস্থা এবং পশুপালন

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নৌকো, ভেলা প্রভৃতি জলযান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া বহু দাঁড়বিশিষ্ট ও বহু পালবিশিষ্ট বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিতো। চাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকায় গরুর গাড়ীর মতো গাড়ি মাল পরিবহনে স্থলপথে ব্যবহৃত হতো। চীন দেশের লোক ঘোড়ার ব্যবহার জানলেও মিশর, সিন্ধু অঞ্চল ও মেসো-পটেমিয়ার লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না। তা ছাড়া গাধা, উট, হাতী মালবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হতো। মাংস ও দুধের জন্য গৃহপালিত পশুর প্রয়োজন ছিল। কৃষির সঙ্গে পশুপালনও তাই সমাজের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠে।

সুমের, মিশর, ভারত ও চীনে ধাতু ও মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। সমস্ত অঞ্চলেই তাঁতের প্রচলন থাকায় তাঁতের সাহায্যে পোশাক পরিচ্ছেদ তৈরী হতো। সুমেরে পশমের পোশাক এবং মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় সুতী কাপড়ের

প্রচলন ছিল। চীনদেশে ছিল রেশমের প্রচলন। রং করা পোড়ামাটির নানা জিনিস সব অঞ্চলেই তৈরী হতো।

দেশে সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটতে থাকায় হিসেব নিকেশ ও নানা ধরণের বিবরণী রাখার প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। ফলে ঐসব অঞ্চলে লিপির উদ্ভব ঘটে। আমরা যেমন অ, আ, ক, খ, ABCD প্রভৃতি বর্ণ বা অক্ষরের সাহায্যে শব্দ তৈরী করি, মিশর বা মেসোপটেমিয়ার লোকেরা সেরকম করতো না। তাদের লেখা ছিল ছবির লেখা। চাঁদ লিখতে হলে তারা হয়তো সম্পূর্ণ চাঁদ বা তার কিছুটা অংশ আঁকতো, কিন্তু পরে এমন হল যে চাঁদ বা তার অংশ আঁকলে চাঁদকে না বুঝিয়ে হয়ত অন্য কিছু যেমন জ্যোৎস্নাকে বোঝাতো। এভাবে শ'য়ে শ'য়ে বছর ধরে পরিবর্তন হতে হতে অবশেষে বর্ণমালার সৃষ্টি হল। অবশেষে নতুন নতুন চিন্তাধারা নানা ধরনের হরফে লিখে রাখা হতো।

লিপি

সুমের, মিশর ও চীনে রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রধান। সিন্ধু উপত্যকায় কিন্তু রাজার নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

প্রচুর শস্য উৎপাদন হওয়ায় ও ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে ধন সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে ধনী সম্পত্তিশালী লোকদের আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া ধর্মকে আশ্রয় করে পুরোহিত সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়। সমাজে বণিক, পুরোহিত ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরাই বেশী প্রভুত্ব স্থাপন করে। ক্রীতদাস ও দরিদ্র জনসাধারণকে চাষবাস ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয়। তাদের পরিশ্রমের ফলে সেকালের বড় বড় প্রাসাদ নির্মিত হয়। সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্যের ফলে তিক্ততা ও বিরোধের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বসতি ও কৃষিক্ষেত্রগুলি গড়ে ওঠায় উদ্বৃত্ত শস্যই ছিল অন্যান্য শিল্প ও বৃত্তির বিকাশের মূল। তাই সব মানুষের নিজের নিজের অধিকার রক্ষার জন্য সবাই যাতে নিজের নিজের প্রাপ্য, ন্যায় ও সুবিচার পায় সেজন্য আইনকানুন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে নদী তীরবর্তী সভ্য অঞ্চলগুলিতেই প্রথম রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার সূচনা ঘটে।

প্রাচীন সভ্য দেশগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নাগরিক সভ্যতা। প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে কৃষিকাজ ও পশুপালন হলেও, শহরও গড়ে উঠে। এই সব শহরে নাগরিক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। এই সময় ব্রোঞ্জের

ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মাটি খুঁড়ে পাওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্র, মন্দির, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, যানবাহন প্রভৃতির নির্মাণ ও গঠন পদ্ধতি দেখে বোঝা যায় যে সেকালের লোকদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল।

দেবদেবীর পুজো সব দেশেই প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল খুব প্রবল। এই সভ্যতার আমলে তাই এক উন্নত সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা থেকে সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় আমরা পাই। আর এই জ্ঞান যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তো, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আদিম পূর্তবিদ্যাও গণিতের অগ্রগতির সহায়ক ছিল। ঘরবাড়ি ও নগর নির্মাণে এবং সেচবিষয়ক পূর্তবিদ্যায় সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চীনাদের সাফল্য গাণিতিকও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। মূল্যবান পাথর ও সোনা রুপোর তৈরী অসাধারণ কারুকার্যমণ্ডিত অলংকারের প্রচলনও এই অঞ্চলসমূহে ছিল। এছাড়া নানা ধরনের ছবি, মাটির কাজ ও হাতির দাঁতের কাজও ঐসব অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছিল। ঐ দেশ-গুলিতে কয়েক হাজার বছর ধরে তৈরী হয়েছিল বহু দালানকোঠা, মন্দির, সমাধি-মন্দির প্রভৃতি যার ধ্বংসাবশেষ আজও মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে।

সাংস্কৃতিক জীবন

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। নদী উপকূলে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল কেন ?

২। নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল কেন ?

৪। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে লিপির উদ্ভব ঘটেছিল কেন ?

৫। প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

৬। নদীমাতৃক সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৭। প্রাচীন সভ্যতাকে কৃষিপ্রধান সভ্যতা বলে কেন তা আলোচনা কর।

৮। সমাজে বৈষম্য কেমন ছিল ? বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা কেমন ছিল ?

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সমাজ

তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে দক্ষতা অর্জনের পর সেকালের মানুষ লোহা আবিষ্কার করে। আকরোদ্ভূত ধাতুপিণ্ড গলিয়ে লোহা তৈরী করার পদ্ধতি এশিয়া মাইনর ও ককেশাশ অঞ্চলের লোকেরা আবিষ্কার করে। ১৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে এভাবে লোহা তৈরীর ব্যাপারে এশিয়া মাইনরের হিটাইটদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। হিটাইট রাজার সৈন্যদলে বেশ কিছু বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তারা লোহা তৈরীর কায়দা কানুন জেনে নিয়েই তা' অন্যদের কাছে ফাঁস করে দেয়। এইভাবে সেখান থেকে ক্রমশঃ পূর্বাঞ্চলে লোহার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। অ্যাসিরিয় নামে এক জাতি মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তাদের প্রধান নগর নিনেভে-তে লোহার তৈরী প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। আনুমানিক ৭০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরে লোহার সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমে পশ্চিম এশিয়া, চীন, ভারত ও মধ্য ইউরোপে লোহার পিণ্ড গলিয়ে নানা ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরী করার কৌশল চালু হয়। ককেশাশ অঞ্চলে সেকালের কবর খুঁড়ে লৌহ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা প্রভৃতি ধাতুর পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা খুব উন্নত ধরনের ইস্পাত তৈরী করতে জানতো। লোহা ব্যবহারকারী কেলট, ডোরিয়ান প্রভৃতি জাতিদের আক্রমণের ফলেই ক্রীট দ্বীপের নসস্-এর ব্রোঞ্জ সভ্যতার পতন ঘটে। তখন থেকেই ক্রীট ও ইজিয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে লৌহযুগের সূচনা হয়।

লোহার আবিষ্কার ও তার ব্যবহার

তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপোর তুলনায় লোহা উৎপাদনে অনেক কম পরিশ্রম লাগে; তা ছাড়া আকরিক লোহা পাওয়াও যায় প্রচুর। তাই যন্ত্রপাতি লোহা দিয়ে তৈরীর প্রথার প্রচলন হয়। ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। লৌহ যুগ আরম্ভ হবার পরে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে।

ব্যবহারের গুরুত্ব

এই সময় কৃষকের নিজের হাতে আসে লোহার কুড়ুল ও লাঙ্গল। এসব

যন্ত্রপাতি পাওয়ার জন্য তাকে আর আগের মত রাজা বা অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করতে হয় না। লাঙ্গল ও কুড়ুল দিয়ে কৃষক যে কোনো জংলা বা পাথুরে জমি উদ্ধার করে তা' চাষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে থাকে। ঠিক তেমনি কারিগরদেরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য রাজা, পুরোহিত বা অভিজাত শ্রেণীর প্রভাবাধীনে থাকতে হয় না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মালিক এখন সে নিজেই। এইভাবে লোহা আবিষ্কারের ফলে কৃষকেরা ও শিল্পীরা পেল আগের যুগের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা।

লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

লৌহযুগের অর্থনীতিতে মুদ্রার আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লিডিয়া দেশে প্রথমে সোনা ও রুপো মিশিয়ে মুদ্রা তৈরী হতো। এই মিশ্র ধাতুর নাম 'ইলেকট্রাম'। গ্রীস দেশে রৌপ্যমুদ্রা ও পারস্যদেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ সালের পর গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলিতে খুচরা রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন হয়। মুদ্রার প্রচলন ব্যবসা বাণিজ্যে ও উৎপাদন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন আনে।

লৌহযুগে মানুষের মুখের ভাষা বদলায়। লেখার ভাষাও উন্নত হয়। যে সব দেশ লৌহযুগে প্রবেশ করেছে সেখানে সাংস্কৃতিক জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্য লৌহ যুগের সৃষ্টি। এই সময় সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রধান অবলম্বন হয়। আর গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে অনেক নতুন বসতি এই যুগেই গড়ে উঠে।

তামা ও ব্রোঞ্জের যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছিল মূল্যবান। তাই তা' সাধারণ মানুষ সহজে সংগ্রহ করতে পারতো না। ঐসব অস্ত্রের জন্য ত দের রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী হতে হতো। কিন্তু এখন যে কেউ স্বল্প ব্যয়ে লোহার যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে এবং সৈনিক বা যোদ্ধা হয়ে উঠে। দেশে বড় বড় সৈন্যদল গঠনও সহজ হয়। লৌহ যুগে অনেক বর্বর জাতি সভ্যতার আওতায় আসে। সস্তা লোহার হাতিয়ারের দৌলতে এরা নতুন নতুন এলাকা আবাদ করে, নতুন নতুন দেশ জয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হওয়ায় রাজারা আগের তুলনায় এখন আরও পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন। এসব বিরাট বাহিনী কেবল স্বদেশেই রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করে না; দেশের পর দেশ জয় করে তাঁরা রাজ্যের সীমা বিস্তার করতে থাকেন। শাসনকার্য

রাজশক্তির বৃদ্ধি

পরিচালনার জন্য রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী ও সেনাপতি নিয়োগ করতে হয়। রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন অঞ্চল জয় করার ফলে সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। রাজ অনুগ্রহে নির্ভরশীল পুরোহিতকুল সর্বত্র রাজতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থকরূপে এগিয়ে আসে। ক্রমশঃ রাজতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। ব্যাবিলন, মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ—সব দেশেরই রাজনৈতিক ইতিহাসে একই দৃশ্যের প্রতিফলন দেখা যায়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। লোহার আবিষ্কার ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

২। লৌহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। লৌহযুগে রাজশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল কেন ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সুমেরের উত্তরে ব্যাবিলন অবস্থিত। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২০০০ বছর আগে অ্যামোরাইট ও ইলামাইট নামে দুই জাতি সমগ্র মেসোপটেমিয়া দখল করে। এই দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে অ্যামোরাইট জাতি জয়লাভ করে। এই সময় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগর স্থাপিত হয়। রাজধানী ব্যাবিলনের নামে রাজ্যেরও নাম হয় ব্যাবিলন। ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে হামুরাবি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত।

উৎপত্তি

হামুরাবির যুগে ব্যাবিলনে বলদ দিয়ে হাল টানার পদ্ধতির প্রচলন হয়। বন্যার জল যাতে ফসলের কোনো ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য ক্ষেতের চার দিকে উঁচু করে আল দেওয়া হয়। নদীর জল ধরে রাখার জন্য বহু খাল খনন করা হয়। হামুবারির পরবর্তী সম্রাট নেবুচাডনেজার ব্যাবিলনে সেচের অতুলনীয় সংস্কার করেন। তিনি ১৪০ মাইল আয়তন বিশিষ্ট একটি বিশাল জলাধার তৈরী করেন।

কৃষিকাজ

ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। এখানকার জমি

ছিল অত্যন্ত উর্বর। অল্প পরিশ্রমে এখানকার জমিতে প্রচুর ফসল ফলতো। কৃষিক্ষেত্রে গম ও যবের সঙ্গে রসুন, পেঁয়াজ, খেজুর, আঙ্গুর, শাক, মুলো, গাজর, এলাচ, জাফরান, বাদাম প্রভৃতির চাষেরও ব্যবস্থা হয়। হামুরাবির পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পশুপালক যাযাবর। তাই হামুরাবি কৃষিকার্যের সঙ্গে পশুপালনের উপরও জোর দেন। তিনি দেশে ভেড়া, ছাগল, গোরু ও উট পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাপক পক্ষীপালনেরও ব্যবস্থা করা হয়।

পশু-পালন

কৃষক ও পশুপালক ছাড়া সমাজে আরও একটি শ্রেণী ছিল। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতো। ব্যাবিলন থেকে বণিকেরা জল-পথে দেশ দেশান্তরে যেসব পণ্য রপ্তানি করতো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাতুনির্মিত নানারকমের পণ্য, মূল্যবান পাথর, কাঠ এবং খাদ্যশস্য। ষাঁড়, গাধা ও উট মালবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হলেও স্থলপথ সিংহ, বুনো শুওর প্রভৃতির জন্য নিরাপদ ছিল না। জলপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল এবং জলযানগুলো যথেষ্ট দ্রুতগামী হয়ে উঠেছিল। তাই নৌ-বাণিজ্যে ব্যাবিলন খুব উন্নতি করে ছিল। গ্রীস ও রোমের ঐতিহাসিকগণ ব্যাবিলনের সুতী ও পশম বস্ত্রের খুবই প্রশংসা করেন। রাজা হামুরাবির আমলে সেখানে শিল্পীদের নিজেদের সংঘ গড়ে উঠে। ব্যাবিলনে যদিও মুদ্রার প্রচলন ছিল না তবুও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সোনা, রুপো প্রভৃতি ধাতু ব্যবহৃত হতো। ধাতুখণ্ড চিহ্নিত ছিল না তবে প্রতিবার ব্যবহারের সময় ঐগুলি ওজন করা হতো। সবচেয়ে ক্ষুদ্র মানের ধাতুখণ্ডকে বলা হতো 'সেকেল'। ষাটটি সেকেলে হতো এক 'মিনা' এবং ষাট মিনায় এক 'ট্যালেণ্ট'। ব্যাবিলনে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি তো বন্ধক রাখতে হতোই এমনকি স্ত্রী-পুত্রদের নামে দস্তখত লিখে দিতে হতো। ঋণ ফেরত দিতে অসমর্থ হলে ক্রীতদাসরূপে মহাজনের গোলামী করা ছিল আইন-সম্মত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যাবিলন রাজ্যে অনেক শহর ছিল। প্রতি শহরেই ছিল দেবতার মন্দির। আর প্রতি মন্দিরেই একজন করে পুরোহিত ছিলেন। এই পুরোহিতদের সঙ্গে ব্যাবিলনের রাজাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে পুরোহিতরা খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন। পুরোহিতদের মহাজনী কারবার ছিল বিরাট। এছাড়া পুরোহিতদের ছিল প্রচুর ক্রীতদাস। শুধু

মন্দির ও পুরোহিত

তাই নয়, শ্রমিকদের উপরও ছিল তাদের অবিসংবাদিত নিয়ন্ত্রণ। কাজেই ক্রীতদাস ও শ্রমিকদের ভাড়া খাটিয়ে পুরোহিত শ্রেণী বেশ ভাল উপার্জন করতো। সমাজে পুরোহিতদের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। লোকে তাদের বিশ্বাস করতো এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখতো। কাজেই তারা অনেক সময় চুক্তির সাক্ষীরূপে কাজ করতো। কোনো কারণে ঝগড়া বিবাদ হলে প্রকৃত বিচার করে পুরোহিতরা তা' মিটিয়ে ফেলতো। ব্যাবিলন শহরের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম 'মার্ডুক' (সৃষ্টির দেবতা) ও অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ছিল ইস্‌থার (প্রেমের দেবতা)। এছাড়াও অন্যান্য অনেক দেবতা ছিলেন। দেবতাদের বহু মন্দির ছিল ব্যাবিলনে। মন্দিরে পুরোহিতদের সঙ্গে মহিলা পুরোহিতও থাকতেন। প্রধানা মহিলা-পুরোহিতের খুব সম্মান ছিল। রাজকুমারীরাই ঐ পদ পেতেন। মন্দিরে বহু দেবদাসী থাকতো। রাজকর মন্দিরে জমা দিতে হতো। কর বস্তুতেই দেওয়া হতো। তাই মন্দিরের পাশে বড় বড় শস্য ভান্ডার ও পশুশালা থাকতো। ঐসব ভান্ডার ও পশুশালার তত্বাবধানের জন্য বহু কর্মচারী থাকতো। হিসেব নিকেশ ও বিবরণ রাখার জন্য বহু লিপিকার থাকতো। মন্দিরগুলি বিদ্যালয়ের কাজ করতো। এখানে শিশুরা সুমেরীয় লিপিগুলি আয়ত্ত করতো।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ব্যাবিলন জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষ, কলা, গণিত, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের রীতিমত চর্চা হতো। ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্র মণ্ডলীকে ১২ ভাগে ভাগ করে প্রতিটির নাম দিয়েছিলেন 'রাশি'। তাঁরা চন্দ্র সূর্য্যের গতি গণনা করে কোন দিনে কি গ্রহণ হবে তা বলে দিতে পারতেন। মাসকে সপ্তাহে ভাগ করা হয়েছিল ৭টি গ্রহের নামে এবং প্রত্যেকটি গ্রহই ছিল ব্যাবিলনীয়দের নিকট এক-একজন দেবতা বিশেষ। যেমন মার্দুক (বৃহস্পতি); নাবু (বুধ); নের্গাল (মঙ্গল); সামাস (রবি); সিন (চন্দ্র); নীনিব (শনি) এবং ইস্‌থার (শুক্র)। ব্যাবিলনবাসীরা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করেন। এই যুগে সুমেরীয় লিপির আরো উন্নতি হয়েছিল। ব্যাবিলনে জাদুকরদের নানা ভেলকি সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করতো। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা মানুষের চিকিৎসার জন্য নানা রকম অস্ত্র এবং ৬৬০ রকমের ওষুধ ব্যবহার করতেন। পাথরের উপর লেখা তাহাদের একখানা চিকিৎসা-শাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। গিলগেমেশের মহাকাব্য থেকে ব্যাবিলনীয় সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া

যায়। মহাকাব্যের উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে প্লাবনের ফলে সব জীব ধ্বংস হয়ে গেলেও রক্ষা পায় শামাস-নাপিস্তিম এবং তারই বংশধর গিলগেমেশ। গিলগেমেশের কার্যকলাপ এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

ব্যাবিলনীয়দের গণিতশাস্ত্রের প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। আমরা গুণবার সময় যেমন বলি এতো 'কুড়ি', ব্যাবিলনীয়রা বলতো এতো 'ষাট'। 'ষাট' ছিল তাদের একক। সেই হিসাবে বৃত্তকে ষাট ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশকে ৬০ মিনিটে এবং প্রত্যেক মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করার পদ্ধতি তাদেরই আবিষ্কার। যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ—সবই ছিল তাদের জানা। এমন কি ভগ্নাংশের প্রয়োগও তাদের জানা ছিল। কিছুটা পরিমাণ জ্যামিতি শাস্ত্রের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল। সুমেরীয়দের মত ব্যাবিলনীয়দের লিখন পদ্ধতিকে বলে কৌণিক বা কীলক পদ্ধতি। মাটির টালির উপর কোণাকার অক্ষরে এক রকম শক্ত কাঠের কলমে লেখা হতো।

প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে পাঠশালা ছিল। ছাত্ররা ভিজে মাটির শ্লেটে লেখা অভ্যাস করতো এবং প্রয়োজনমত কাঠ বা পাথরের টুকরো দিয়ে লেখা ঘষে বা মুছে ফেলতো। এই রকম একটা স্কুল বাড়ী মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে।



হামুরাবি

হামুরাবি

সে-যুগে ব্যাবিলনের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হামুরাবি। তিনি আনুমানিক ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাজত্ব করতেন। তিনি সমস্ত মেসোপটেমিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকালে ব্যাবিলনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁর সময় ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। যদিও প্রতিবেশী রাজাদের সাথে তাঁর অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তবুও তিনি নিজের রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ৪০ বছরের বেশী রাজত্ব করেন হামুরাবি। প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেশের প্রচলিত

হামুরাবির আইন

আইন-কানুনগুলো সংকলন করেন। একটি আট ফুট লম্বা পাথরের উপর হামুরাবির আইন খোদাই করা হয়েছিল। পাথরের উপর খোদাই-করা যে ২৫৮টি আইন সুসা নগরী থেকে

উদ্ধার করা হয়েছে তা' এখন প্যারিসের জাদুঘরে আছে। ব্যাবিলনবাসীরা বিশ্বাস করত যে, দেবতা মার্ডুকের কাছ থেকে হামুরাবি আইনগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

এই আইনগুলো থেকে তখনকার ব্যাবিলনীয়সমাজের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে রাজার পরেই স্থান ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পুরোহিত ও উচ্চ-রাজ-কর্মচারীদের। এছাড়া সমাজে সমৃদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—বণিক ও শিল্পী। সমাজে সর্বনিম্ন শ্রেণী ছিল শ্রমিক ও ক্রীতদাস। সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বময় প্রভু। সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল উঁচুতে। স্ত্রী ও বিধবা উভয়েরই অধিকার সুরক্ষিত ছিল। আইনে সম্পত্তির অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতি ও বিবাহ সম্পর্কেও বিশেষ নির্দেশ ছিল। বিধবা, অনাথ ও গরীবদের রক্ষার জন্যও আইনে বিধান ছিল। চিকিৎসক, শ্রমিক, রাজকর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বেতনও আইনে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার ছিল সকলেরই ; তবে নারীদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসরা দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার সুযোগ পেতো। কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের ফলে ব্যাবিলনে বেশ কিছুকাল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

১। প্রাচীন ব্যাবিলনে কৃষি ব্যবস্থা কি রকম ছিল ?

২। সেখানে পুরোহিতদের কি কি কাজ করতে হোত ?

৩। হামুরাবি কে ছিলেন ? তাঁর আইনের বইতে বিভিন্ন অপরাধের জন্যে কি ধরনের শাস্তির বিধান উল্লেখ করা আছে ?

৪। ব্যাবিলনের সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষ বাস করত ?

৫। ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর

পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত হিক্সস্ জাতির আক্রমণে পুরোনো মিশরীয় সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ে। আনুমানিক এক'শ বছর হিক্সসরা মিশরে রাজত্ব করে।

হিক্সস্ আক্রমণ

তাদের কাছ থেকে মিশরীয়রা অশ্বারোহণ বিদ্যা এবং লোহার ব্যবহার জানতে পারে। হিক্সসরা নদীমাতৃক

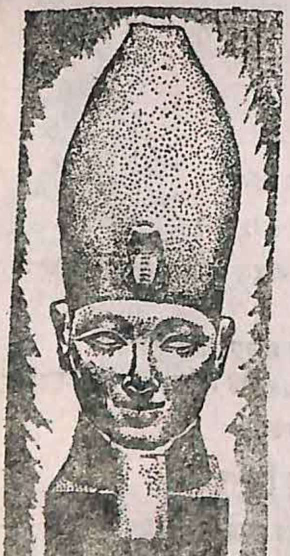
দেশে বাস করে এবং মিশরীয়দের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে হিক্‌সস্‌দের বিরুদ্ধে মিশরে বিপ্লব দেখা দেয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত থিব্‌সের লোকেরা। ফলে তারাই হল সমগ্র মিশরের একচ্ছত্র অধিপতি। উত্তরের রাজধানী মেম্‌ফিস্‌ থেকে রাজ্যের ভারকেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণে থিব্‌সে। মিশরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল অষ্টাদশতম রাজবংশ।

অষ্টাদশতম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

হিক্‌সস্‌রা মিশরে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করেছিল। কিন্তু এই বিদেশী শাসন মিশরীয়রা সহজে মেনে নেয় নি। মিশরীয়রা শেষ পর্যন্ত এই বিদেশী শসিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। ফলে মিশর কেবল স্বাধীন হয়ে উঠে নি, লোহাস্ত্র, অশ্ব ও অশ্বচালিত রথের ব্যবহার শিখে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

সম্রাট তৃতীয় থুতমিস

অষ্টাদশবংশীয় ফারাও তৃতীয় থুতমিস এক দুর্জয় সৈন্য-বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মিশর নৌশক্তিতেও বলীয়ান হয়ে উঠে। তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ফিনিসিয়া জয় করেন। সাইপ্রাস, ক্রীট প্রভৃতি ঈজিয়ান ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি দক্ষিণে নিউবিয়া পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তার করেন। এইভাবে এক বিশাল মিশরীয় সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে।



তৃতীয় থুতমিস

তৃতীয় থুতমিস যেসব রাজ্য জয় করেন, সেগুলিকে তিনি নিয়মিত রাজকর দিতে বাধ্য করেন। পদানত দেশগুলিতে তিনি বিশ্বস্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঐসব দেশের গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানসমূহে মিশরীয় সেনাপতির অধীনে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখেন। অধীন রাজ্যগুলির শাসন-কর্তারা তাঁদের পুত্রদের মিশরে এনে মিশরীয় রীতিনীতি ও আদব-কায়দায় শিক্ষিত ক'রে তোলেন। শাসনকর্তাদের

মৃত্যু হলে তারা পিতার জায়গায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হতো এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মিশরীয় হওয়ায় মিশরের প্রতি তারা অনুগত থাকতো।

ফারাওদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর প্রতিপত্তি গেল অনেক বেড়ে। ফারাওরা যুদ্ধ জয় করে অন্যান্য দেশ থেকে যে অজস্র ধন-সম্পদ লুঠ করে আনতো তার একটা বৃহৎ অংশ মন্দিরের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করতো। এছাড়াও বিজিত দেশগুলি থেকে প্রতি বছর যে কর আদায় হতো তারও ভাগ পেতো মন্দিরগুলি। এর ফলে মন্দিরগুলিতে প্রতি বছর অপরিমিত ধন-সম্পদ জমা হতে লাগল। ফলে মন্দিরের সেবায়েৎ পুরোহিতশ্রেণীরও ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে গেল। ফারাও তৃতীয় রামেসিসের সময় তারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এই সময়ে পুরোহিতশ্রেণীর অধীনে ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল ১০৭,০০০ জন অর্থাৎ মিশরের জনসংখ্যার প্রায় তিরিশ ভাগের এক ভাগ। সমগ্র মিশরের চাষযোগ্য জমির সাত ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৭৫০,০০০ একর জমির মালিক ছিল তারাই। তাদের ছিল ৫০০,০০০ গবাদি পশু। এছাড়াও মিশর ও সিরিয়ার ১৬৯টি শহরের রাজস্ব ছিল এই পুরোহিতশ্রেণীরই প্রাপ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার পুরোহিত-শ্রেণী এই যে বিশাল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ভোগ করতো, তার জন্য কিন্তু রাজ-কোষাগারে তাদের কর হিসাবে কিছুই দিতে হতো না।

পুরোহিতদের ক্ষমতা

ফারাও চতুর্থ আমেনহোতেপ ইখনাটন নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি পুরোহিতদের দুর্নীতি, তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমেই থিবস্ থেকে রাজধানী তুলে এনে তেল-এল-আমার্না নামক স্থানে সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বহুদেবতার পরিবর্তে একমাত্র দেবতা 'এটন'-এর উপাসনা প্রবর্তন করার আদেশ জারী করেন।

ইখনাটন

বহু দেব-দেবীর পুজো বন্ধ হয়ে গেলে পুরোহিতদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে পুরোহিতরা ফারাও-এর বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত শুরু করে। এদিকে চতুর্থ আমেনহোতেপের ধর্মসংস্কারের ফলে মিশরের সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। সেই সুযোগে মিশরের উপনিবেশগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই অবস্থায় মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৩৬২ অব্দে চতুর্থ আমেনহোতেপ বা ইখনাটনের মৃত্যু হয়।

ইখনাটনের পর টুটেনখামন পুরোহিতদের সাহায্যে সিংহাসনে বসেন। তিনি পুরোহিতদের প্রভাব ও মনের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যত্নবান হন। দেবতা 'এটন' ও ইখনাটনের নাম ক্রমে ক্রমে রাজ্য থেকে মুছে যায়। মিশরে পুনরায় পুরোহিত ও ধর্মের প্রভাব স্থাপিত হয়।



ফারাও ইখনাটন

মিশরীয় সাম্রাজ্যের শেষ অন্যতম ফারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস্। মিশরের রাজকোষ পূর্ণ করবার জন্য তিনি নুবিয়ার স্বর্ণখনি আক্রমণ করে প্রচুর স্বর্ণ লাভ করেন। এরপর তিনি প্যালেস্টাইন ও এশিয়ার অন্যান্য উপনিবেশগুলো পুনরুদ্ধার করেন।

খ্রীষ্ট-পূর্ব একাদশ শতাব্দী থেকে মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাজা ও পুরোহিতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যকে একেবারে দুর্বল করে ফেলতে থাকে। অবশেষে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্ডার মিশর দেশ জয় করেন। এর পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমানরা মিশর জয় করেন।

মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

১। কোন্ বিদেশী জাতি মিশর অধিকার করেছিল? কে তাদের তাড়িয়ে মিশরকে আবার স্বাধীন করেন?

২। তৃতীয় থাটমোস কি ভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন?

৩। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় কি ভাবে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন?

৪। ফারাও ইখনাটন সম্বন্ধে কি জান লেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইরানের কথা

পারস্যের উত্থান ঃ ইরানের ইতিহাস আর্যদেরই ইতিহাস। 'ইরান' শব্দটি

এসেছে আর্য শব্দ থেকে। মধ্য এশিয়া থেকে আর্যদের নানা শাখা হয়তো নানা পথ দিয়েই এদেশে প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান উপজাতি মিডি, পারসী প্রভৃতি।

মিডিরা কখন এবং কিভাবে রাজ্য গড়তে আরম্ভ করে তার অনেক কাহিনী আছে ; তবে তাকে ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। দিওছেসের নেতৃত্বে তারা নিজেদের দুর্ধর্ষ জাতি হিসেবে গড়ে তোলে। তাদের পরাক্রমে শংকিত হয়ে অ্যাসিরিয়ার রাজারা মিডিদের রাজ্য মিডিয়া আক্রমণ করে। অ্যাসিরিয়া ও মিডিদের এই বিরোধ নিষ্পত্তি হয় মিডিদের রাজা সিয়াক্জারেসের আমলে। সিয়াক্জারেসের আক্রমণে এ্যাসীরিয়ান (অসুর) দের রাজধানী নিনেভ ধ্বংস হয়। অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে সিয়াক্জারেস পশ্চিম-এশিয়া দখল করে লিডিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই সময়ে সূর্যগ্রহণ হওয়ায় লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস বেঁচে যায়। উভয় দেশের রাজারা স্বীকার করেন যে সূর্যগ্রহণের সময় যুদ্ধ চলতে পারে না। এর অল্প কিছুদিন পরেই সিয়াক্জারেসের মৃত্যুর ফলে মিডিয়ার পতন আসন্ন হয়ে উঠে।

কুরুষ

মিডিদের অধীনে ছিল পারসী নামে আর্যদের এক উপজাতি। তাদের সর্দার ছিলেন কুরুষ। কুরুষ অত্যাচারী মিডিরাজ এ্যাষ্টিয়াগেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এ্যাষ্টিয়াগেসের অত্যাচারে সকলের প্রাণ তখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। সবাই এমনকি মিডিরা পর্যন্ত কুরুষের সংগ্রামকে অভিনন্দিত করতে থাকে। অবশেষে মিডিদের রাজধানী একবাটানা অধিকার করে কুরুষ নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

কুরুষ ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। মিডি ও পারসীকদের নিয়ে তিনি এক অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সার্ডিস ও ব্যাবিলন অধিকার করে তিনি পশ্চিম এশিয়ার হাজার বছরের সেমেটিক্ শাসনের অবসান ঘটান। অ্যাসীরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, লিডিয়া ও এশিয়া মাইনর পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে এত বড় সাম্রাজ্য আর কেউ গড়ে তুলতে পারেনি। কুরুষ ভারতবর্ষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। রাজ্য জয়ের নেশা বড় নেশা। অবশেষে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি প্রাণ হারান।

কুরুষের পুত্র ক্যাম্বিসেসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩০—৫২১) সময় মিশর পারস্য

সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর আর মিশর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ক্যাম্বিসেসের মৃত্যুর পর পারস্যের মধ্যে দেখা দিল অরাজকতা ও চক্রান্ত। অনেক রক্তপাতের পর আকামেনীয় বংশের দরায়ুস সিংহাসন দখল করেন। দরায়ুস তার রাজা হওয়ার ঘটনাটি খুব ফলাও করে বেহিস্তান নামে এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়েছিলেন। তিনটি ভাষায় এই লেখাটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। পৃথিবীতে আর্য-ভাষায় এত পুরাতন শিলালেখ আর নেই। কুরুষের মৃত্যুর পর অরাজকতার সুযোগে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং অঞ্চলগুলি স্বাধীন হয়ে উঠে। দরায়ুস কঠোরভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করেন এবং পুনরায় মিশর, লিডিয়া, সুসিয়ানা, ব্যাবিলনিয়া, অ্যাসিরিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। ভারতবর্ষের গান্ধার অঞ্চল পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের সংখ্যা ছিল মোট ২০টি। ঈজিয়ান সমুদ্র উপকূলবর্তী আইওনিয়াও দরায়ুসের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।


পারস্য সম্রাট দরায়ুস

দরায়ুস

দরায়ুস শুধুমাত্র রাজ্যবিজেতা ছিলেন না—তিনি ছিলেন প্রকৃত সুশাসক। শাসনের সুবিধের জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ২০টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।

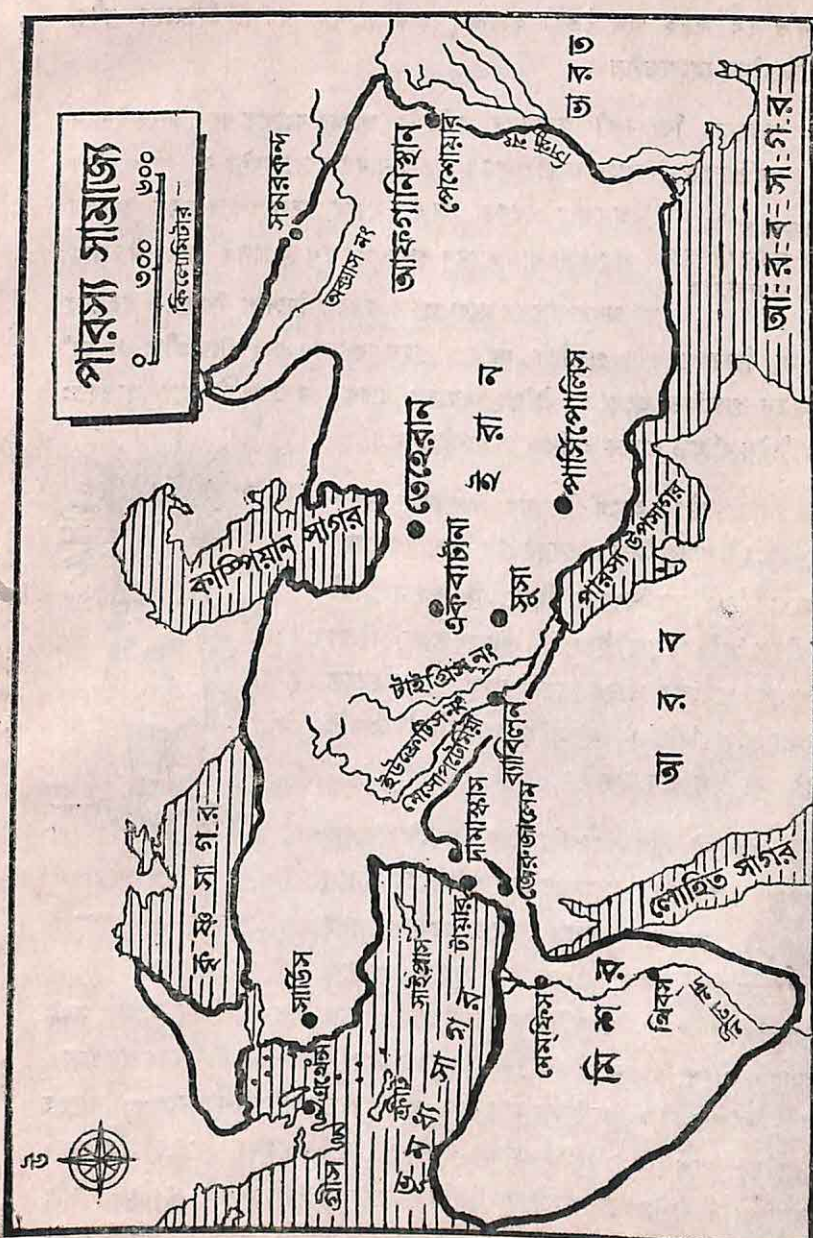
প্রদেশ শাসন-ব্যবস্থা

অধীনস্থ দেশগুলি থেকে বরাদ্দমতো রাজস্ব—তা সোনায় হোক বা জিনিস-পত্রে হোক—নিয়মিত পাঠালেই কেন্দ্রীয় সরকার খুশী থাকতেন। ভারতবর্ষ পাঠাতো সবচেয়ে বেশী—৪৬৮০ ট্যালেন্ট (একরকম স্বর্ণ মুদ্রা)। এছাড়াও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে শস্য এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হতো।

কোন সাম্রাজ্য শাসন ও শোষণ করতে গেলে সৈন্য চাই ও ভাল সড়ক চাই; অর্থাৎ রাস্তাঘাট ভাল না থাকলে সৈন্যদলের চলাফেরা সহজ হয় না এবং রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে সেই সংবাদও নিয়মিত জানা যায় না। আগেকার হিটাইট রাজাদের আমলে কতকগুলি মজবুত সড়ক সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—সেগুলি নতুন করে সংস্কার করা হয়।

রাস্তাঘাট

দরায়ুস সাম্রাজ্য শাসনের জন্য পার্সিপোলিস, একবাটানা, সুসিয়ানা প্রভৃতি



স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিভিন্ন রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার

জন্য সড়ক নির্মাণ করা হয়। লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস থেকে সুসিয়ানা পর্যন্ত যে সড়ক পথ তৈরী হয়েছিল তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস।

পারস্যের কিংবদন্তী অনুসারে খৃীষ্টের জন্মের বহুশত বছর আগে ইরানে এক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম জোরোয়াষ্টার বা জরথুষ্ট্র।

পারস্যের প্রাচীন ধর্মপ্রবর্তক-জোরোয়াষ্টার বা জরথুষ্ট্র ঃ

আলোর দেবতা আহুর-মজ্‌দা জরথুষ্ট্রের হাতে নিজের আবেস্তা বা জ্ঞানের গ্রন্থ সমর্পণ করলেন এবং ঐ গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার নির্দেশ দিলেন। ইরানের রাজা বিস্তষ্প তাঁর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করলেন এবং ধীরে ধীরে এই ধর্ম ইরানে প্রচারিত হলো। ঐতিহাসিকদের ধারণা যে জরথুষ্ট্র খুব সম্ভবতঃ খৃীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

জরথুষ্ট্রের আগে ইরানের লোকেরা বহু-দেবতার উপাসক ছিল। তাদের উপাসিত দেবতাদের মধ্যে ছিল সূর্য-দেবতা মিথ্র, উর্বরতার দেবী অণৈত, পৃথিবী দেবী ইত্যাদি। এছাড়া তারা বিভিন্ন পশুরও পুজো করতো। পারসীকদের পুরোহিতকে বলা হতো 'মাগ'। এই মাগ পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল খুব বেশী।


জরথুষ্ট্র

জরথুষ্ট্র মাগ পুরোহিতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বহুদেবতাদের পরিবর্তে তিনি একটিমাত্র দেবতার অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। সেই দেবতার নাম আহুর-মজ্‌দা। আহুর মজ্‌দা আলোকের দেবতা, জ্যোতির্ময় বিশ্বাত্মা। পৃথিবীতে যা কিছু ভালো সবই আহুর-মজ্‌দা-র দান। আহ্রিমন হ'ল এর উল্টোশক্তি—সেমেটিকদের শয়তানের মত শক্তিশালী। আহ্রিমন মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে—মানুষের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। জরথুষ্ট্র মূর্তিপুজার বিরোধী ছিলেন। যাগযজ্ঞ এবং প্রার্থনার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর আমলে পারস্যে কোন দেবমন্দির বা দেবীমূর্তি তৈরী হয়নি। দেশের সর্বত্র নির্মিত হয়েছিল যজ্ঞবেদী। কিন্তু জরথুষ্ট্র প্রচারিত এই ধর্ম বেশীদিন

অবিকৃত থাকেনি। মগি পুরোহিতদের প্রভাবে জরথুস্ট্রের ধর্মের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। কুরুষ কে ছিলেন? তিনি কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন? কাদের নিয়ে তিনি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন? কোন্ কোন্ জায়গা দখল করে তিনি কত বড় সাম্রাজ্য গড়েছিলেন? কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারালেন?

২। দরায়ুস কে? কোন্ জায়গায়, কিভাবে তিনি তাঁর রাজা হওয়ার কথা লিখে রেখেছেন? তাঁর সাম্রাজ্যে কয়টি প্রদেশ ছিল?

৩। দরায়ুস কি শুধু রাজ্য বিজেতা ছিলেন? সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তিনি কি পন্থা নিয়েছিলেন? ভারতবর্ষ তাঁকে কত রাজস্ব দিত? ঐতিহাসিক হেরোডোটাস কোন্ রাস্তার বর্ণনা দিয়েছেন?

৪। আহুর-মজদা কে? আবেস্তা কি? জরথুস্ট্র কে? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন? কোন রাজা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন? 'মগি' কাদের বলা হত? জরথুস্ট্রের আমলে ইরানে কোন্ জিনিস বেশী নির্মিত হয়েছিল?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহুদী জাতির কথা

ইহুদীরা মধ্য প্রাচ্যের এক প্রাচীন জাতি। এদের আদি বাসভূমি ছিল আরবদেশের মরু-অঞ্চলে। এখানে চাষ-আবাদ হতো না। খাদ্য পানীয় কোনটাই সহজে পাওয়া যেতো না। এই কারণে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ানোতে অভ্যস্ত ছিল। পশুচারণের ক্ষেত্র এবং চাষ আবাদের উপযোগী জমি খুঁজতে খুঁজতে ইহুদিরা এক সময় প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হয়। প্রথমে এই অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় এরা বসবাস করতে থাকে। ক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের রীতি নীতি গ্রহণ করে এই দেশকে তারা স্বদেশ বলে মনে করতে শেখে। কিন্তু এখানকার জমির আয়তন ছিল খুবই সীমিত। সুতরাং শুধু মাত্র এই অঞ্চলটি সম্বল করে তাদের পক্ষে স্বচ্ছল জীবন যাপন করা সম্ভব ছিল না। আরও

ইহুদীরা মিশরে অবাঞ্ছিত আগন্তুক

নতুন জমির খোঁজে তারা এসে হাজির হয় মিশর দেশে। এখানে তখন ফ্যারাওদের কঠোর শাসন। ফ্যারাও এবং তাঁর পরামর্শদাতারা এই আগন্তুকদের সুনজরে দেখলেন না। ফলে ইহুদীদের ভাগ্যে ঘটতে থাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান। এরা ক্রীতদাস বলে গণ্য হয় ; স্বাধীনভাবে চলাফেরা অথবা জীবিকা নির্বাহের কোন অধিকারই এদের থাকে না। কোন ইহুদী ক্রীতদাসের পুত্রসন্তান জন্মালে সরকারী আদেশে তাকে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

ইহুদীদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে তাদের ত্রাণকর্তা **মোজেস** বা **মুসার** উল্লেখ আছে। তিনি ছিলেন এক ক্রীতদাস পরিবারের সন্তান। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাঁকে নদীর জলে নিক্ষেপ করতে হবে—এ কথা সকলেই জানতো।

মোজেস-এর জন্ম ও বাল্যজীবন

কিন্তু মুসার মা সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারলেন না। নলখাগড়ার একটি ঝুড়িতে করে তিনি শিশুসন্তানকে রেখে এলেন নদীর কিনারায় এক ঝোপের আড়ালে। ফ্যারাও-এর কন্যা শিশুটিকে এই অবস্থায় দেখে তার প্রাণরক্ষা এবং লালন পালনের ব্যবস্থা করলেন। শিশু ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করল। এই সময় মিশরের এক অত্যাচারী নাগরিকের নিষ্ঠুরতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে যুবক মুসা তার প্রাণনাশ করেন। এরপর মিশরে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে মুসা মিশর ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

শেষ পর্যন্ত এই সংকল্প মুসা কাজে পরিণত করতে পারেননি। দৈববাণী হল, তাঁকে আরও কিছু দিন মিশরে থাকতে হবে। এর কিছুকাল পরে দাসত্ব

মুসার নেতৃত্বে দাসত্ব হতে মুক্তিলাভের আশায় ইহুদীদের মিশর ত্যাগ

হতে মুক্তিলাভের আশায় মুসা তাঁর স্বজাতীদের নিয়ে যাত্রা করলেন অজানা পথে। বহু কষ্টে লোহিত সাগর এবং মরুভূমি অঞ্চল অতিক্রম করে দলবল নিয়ে তিনি পেঁছোলেন সিনাই পর্বতের পাদদেশে। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এখানে অবস্থান কালে তিনি দৈববাণী শুনেছিলেন। এই বাণীতে দশটি নির্দেশ রয়েছে। ঈশ্বরের দশটি আদেশ মুসা সঙ্গীদের শোনালেন। আদেশগুলি হোল—(১) ঈশ্বর এক, কেবল তাঁরই পুজো করবে। (২) পুতুল পুজো করবে না। (৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম নেবে না। (৪) সপ্তাহে একদিন কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মকর্ম করবে। (৫) পিতামাতাকে ভক্তি করবে। (৬) নরহত্যা করবে না। (৭) চরিত্র নির্মল রাখবে। (৮) চুরি করবে না। (৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। (১০) প্রতিবেশীর সম্পদ দেখে ঈর্ষা করবে না। এই বাণীর

প্রভাবেই ইহুদীরা মূর্তিপূজোর পরিবর্তে গ্রহণ করে এক অদ্বিতীয় ঐশী শক্তির আরাধনার আদর্শ। এই ঘটনার পর চল্লিশ বছর জীবিত থাকলেও মুসার জীবদ্দশায় ইহুদীরা কোন স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচন করতে পারেনি। কিন্তু মুসার নেতৃত্বে এই সরল মেষপালকরা একটি অখণ্ড একপ্রাণ জাতিতে পরিণত হয়।

ইহুদিরাজ্য প্রতিষ্ঠা

দুর্ভাগ্যক্রমে এই নতুন অঞ্চলেও ইহুদীরা নিরুপদ্রবে থাকতে পারেনি। এখানে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফিলিস্টইন জাতি। এদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ইহুদীদের আরও পশ্চিমে সরে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। লেবানন পর্বতের দক্ষিণ হতে শুরু করে হেব্রোন পর্যন্ত অঞ্চলে জুড়ে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহুদীদের স্বাধীন রাজ্য ইস্রায়েল। এই রাজ্যের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন **ডেভিড**। ইনি প্রতিবেশী ফিলিষ্টাইনদের পরাজিত করে জেরুজালেমের দুর্গ অধিকার করেন। ডেভিডের পুত্র **সলোমন** পাণ্ডিত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। এদের রাজত্বকালে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই সব মন্দিরের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল জেরুজালেমের মন্দির।

সলোমনের মৃত্যুর (খ্রীঃ পূঃ ৯১৬) পর ইহুদি রাজ্য **ইস্রায়েল এবং জুডা** নামে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে ইহুদীদের শক্তি হ্রাস পায় এবং খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে এই দুটি রাজ্য অ্যাসিরিয়া সাম্রাজের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরে অ্যাসিরিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চলে স্থাপিত হয় পারসিকদের প্রভুত্ব।

ওল্ড টেস্টামেন্ট

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ দান হিব্রু ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর অন্তর্ভুক্ত **ওল্ড টেস্টামেন্ট**। এই গ্রন্থটিতে ৩৯টি অধ্যায়ে আছে সৃষ্টির আদিম রহস্য, জাতির প্রধান ধর্মগুরুদের বাণী, কাব্য, নীতিকথা, আইনের সংকলন এবং গল্প ও উপাখ্যান। ইহুদীদের একমাত্র উপাস্য দেবতা যেহোভা। যীশু খ্রীষ্টের বাণী সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

১। ইহুদিরা যখন প্রথম মিশরে প্রবেশ কধে তখন কারা সেখানে রাজত্ব-

করছিল ? তারা মিশর থেকে বিতাড়িত হবার পর মিশরে ইহুদিদের অবস্থা কি হয়েছিল ?

২। মুসা কে ছিলেন ? তিনি ঈশ্বরের কি আদেশ পেয়েছিলেন ?

৩। মুসা কিভাবে ইহুদিদের মুক্ত করেছিলেন ?

৪। মুসা ঈশ্বরের যে দশটি আদেশ সঙ্গীদের শুনিয়েছিলেন সেই দশটি আদেশ কি ?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(ক) একজন ইহুদি মিশরের শাসনকর্তা হয়েছিলেন—তাঁর নাম কি ?

(খ) ইহুদিদের প্রতি মিশরের ফ্যারাওয়ের কি নির্দেশ ছিল ?

(গ) মিশরে ইহুদিদের কি বলা হোত ?

(ঘ) কানান দেশটি কোথায় ?

(ঙ) আব্রাহাম কে ? তিনি কি প্রচার করেছিলেন ?

(চ) ইহুদিদের ত্রানকর্তার নাম কি ?

(ছ) ওল্ড টেস্টামেন্ট কাকে বলে ?

———

সপ্তম অধ্যায়

গ্রীস

ইউরোপ মহাদেশের যে অঞ্চলটিতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল তার নাম গ্রীস। **ঈজিয়ান সাগরের** পশ্চিমে অবস্থিত উপদ্বীপ ও তার আশপাশের দ্বীপগুলিকে গ্রীস বলতে বোঝায়। এই ভূখণ্ড পর্বতে ও সমুদ্রের খাঁড়িতে পূর্ণ। তাই এর এক স্থানের সঙ্গে অন্য স্থানের যোগাযোগ সংকীর্ণ গিরিপথ বা জলপথ দিয়েই ঘটে থাকে। এই ভূখণ্ডের মধ্যভাগের নাম **এটিকা**। এটিকার দক্ষিণে **করিন্থ সাগর**। তার দক্ষিণে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম **পেলোপনেসাস**। এটিকা ও পেলোপনেসাস পূর্ব দিকে **করিন্থ যোজকের** দ্বারা সংযুক্ত।

গ্রীকদের আগমন

পূর্ব ইউরোপ, মধ্য-ইউরোপ ও মধ্য-এশিয়া থেকে আর্যজাতির দক্ষিণে



গ্রীস ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল

অগ্রসর হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যজাতির কতকগুলি উপজাতি দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের তৃণভূমি ছেড়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে গ্রীসের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

তারা বহু উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এইসব উপজাতি একের পর এক এসেছিল। এরা গ্রীসের ভূখণ্ড ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিকে বলত **হেলাস**। আর নিজেদের বলতো **হেলেনিজ**।

উত্তর থেকে গ্রীকরা যখন গ্রীসদেশে প্রবেশ করে, তখন ঈজিয়ান সাগরের মুখে ভূমধ্যসাগরে **ক্রীট** নামে একটি দ্বীপ অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসভ্য হয়ে উঠে। গ্রীকরা ছিল কৃষক ও পশুপালক। তারা অন্যান্য আর্য উপজাতির মতো লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো। তবে তারা ক্রীটানদের তুলনায় দুর্বল ও অসভ্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে

ক্রীটের সভ্যতা

ক্রীটানরা সভ্যতা ও শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তামার খনি, কৃষি, শিল্প ও সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল তাদের এই উন্নতির মূলে। ক্রীটের রাজধানী **নোসস** ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডেও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম।

গ্রীক উপজাতিগুলি ক্রীটানদের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই সভ্য ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। গ্রীসদেশে তারা অনেক নগর, জনপদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গ'ড়ে তোলে। পেলোপনেসাসের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত **মাইসেনি-ই** ছিল তাদের প্রধান রাজ্য। মাইসেনির রাজা সমস্ত গ্রীক রাজ্যগুলির অধিরাজ বলে স্বীকৃত হতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রীটের রাজধানী নোসস সমুদ্র-দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লুণ্ঠিত ও আগুনে ভস্মীভূত হ'লে ক্রীটানরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ও ঈজিয়ান অঞ্চলে গ্রীকরা ক্রীটানদের স্থান অধিকার করে।

গ্রীসের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধের কাহিনী ও যোদ্ধাদের কীর্তি

হোমারের মহাকাব্য

নিয়ে অনেক গাথা রচিত হয়। ঈজিয়ন সাগরের শিয়স দ্বীপের অধিবাসী হোমার নামে একজন অন্ধ কবি প্রাচীন গ্রীসের যুদ্ধ-বিগ্রহের অনেক কাহিনী নিয়ে 'ইলিয়ড' ও 'ওডেসি' নামে দু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন। ইলিয়ডের বিষয় ট্রয়ের যুদ্ধ আর ওডেসির বিষয় হল ট্রয়ের পতনের পর রাজা ওডিসিয়সের বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। ওডিসিয়স ইথাকা নামে একটি ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই দুই মহাকাব্য থেকে গ্রীক ইতিহাসের আদিযুগের অনেক কথা জানা যায়।

হোমারের মহাকাব্যে সমাজের যে ছবি আছে তা' এই রকম। তখন গ্রীকরা

কৃষিকার্য, পশুপালন করতো। তারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করতো। জনসাধারণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ঃ অভিজাত, সাধারণ মানুষ, থেটস ও ক্রীতদাস। অভিজাত শ্রেণী বড় বড় খামারের মালিক ছিল। ছোট ছোট জমির মালিকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। জমিহীন মানুষদের থেটস বলা হতো, কিন্তু তারা দাস ছিল না। যুদ্ধবন্দীরাই ক্রীতদাস হতো। জলদস্যুদের কাছ থেকেও ক্রীতদাস কিনে নেওয়া হতো। ক্ষেতখামারে ও বাড়ীর কাজে ক্রীতদাসদের ব্যবহার করা হতো। হোমারের যুগে রাজা দেশের শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বৈরাচারী হতে পারতেন না। তাঁকে আর দশজনের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হতো। রাজ্য শাসনে রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ পাওয়া যায়।

সমাজ জীবন

সমাজের কেন্দ্র ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তাই ছিলেন সর্বেসর্বা। সকলকেই তার হুকুম মেনে চলতে হতে। জমি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; জমির মালিকানা ছিল পরিবারের। উচ্চ নীচ সবাই শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল। মেয়েরা চরকা কাটতো, তাঁত বুনতো আর সেলাই করতো। সমাজে মেয়েদের স্থান সম্মানের ছিল। গ্রীকদের প্রধান খাদ্য মাংস। তারা সুরাপান করতো; ছাগলের দুধের দৈ তাদের প্রিয় ছিল। মৃত্যু হলে শব দাহ করা কিংবা কবর দেওয়া এই দু'রকম প্রথাই প্রচলিত ছিল। হোমারের কাব্যে বর্ণিত সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। তার ফলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো।

পরবর্তী কালে নগরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসে গড়ে উঠে অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্র। এই সব রাষ্ট্র আয়তনে ছিল ছোট। জনসংখ্যাও ছিল সীমিত। তাই রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতো। এর ফলে অভিজাত-তন্ত্রের স্থলে গ্রীসের বহু অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করে এথেন্স।

নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব

বহু নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠার ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ জুড়ে বহুকাল পর্যন্ত একটি অখণ্ড রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ছোট ছোট অনেকগুলি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠিত হওয়ার ফলে গ্রীসদেশে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি কারণে ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। যে

কোন রাষ্ট্রের প্রজাই হোক না কেন, প্রত্যেক গ্রীসবাসী বিশ্বাস করতো যে তারা সকলেই এক পূর্বপুরুষের বংশধর। কিংবদন্তীর এই পূর্বপুরুষের নাম ছিল হেলেন। এই জন্য গ্রীস দেশের প্রাচীন নাম হেলাস ; গ্রীকরাও 'হেলেনিজ' নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক গ্রীসবাসীর মধ্যে একই রক্তধারা প্রবাহিত—এই বিশ্বাস রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকের মনে জাগিয়ে তুলতো এক নিবিড় ঐক্যবোধ। তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য ছিল গ্রীকদের কাছে জাতীয় সাহিত্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রজা হলেও তারা সকলে একই ভাষায় কথাবার্তা বলতো। তারা সকলেই একই দেবদেবীর উপাসনা করতো। প্রতি বছর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দেবমন্দিরগুলি দর্শন করা তারা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। গ্রীকদের মধ্যে অপর প্রধান সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম ছিল অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। গ্রীক দেবতাদের রাজা জিউস-এর সম্মানে প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিক নামে প্রধান যে খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হতো তাতে সব গ্রীক-রাষ্ট্রের লোকেরা যোগ দিতো। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল গভীর ও দৃঢ় ঐক্যবোধ।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

খ্রীষ্ট-পূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে গ্রীকদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তারের যুগ শুরু হয়। এই দেশটির অধিকাংশই পাহাড়-পর্বতে ভরা। চাষ-আবাদের সুযোগ-সুবিধে খুব বেশী ছিল না। ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও খাদ্যের অভাবে গ্রীকেরা দেশের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

উপনিবেশ বিস্তার

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে ছিল ফিনিশীয়দের অঞ্চল। প্রথমেই গ্রীকরা তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফিনিশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে। এরপর ক্রমে ক্রমে ইটালী, স্পেন ও এশিয়া-মাইনরে গ্রীকদের উপনিবেশ গড়ে উঠে। দক্ষিণ ইতালীতে গ্রীক উপনিবেশের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে, এই অঞ্চলকে বলা হত 'ম্যাগনা-গ্রেসিয়া' অর্থাৎ 'বৃহত্তর গ্রীস'। সিসিলিতে সাইরাকুস নামে গ্রীক উপনিবেশটি খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

এভাবে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বহু গ্রীক উপনিবেশের প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতৃভূমির সঙ্গে গ্রীক উপনিবেশগুলির কোন রাজনৈতিক বন্ধন ছিল না।

তারা সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো। মূল গ্রীস ভূখণ্ডের সংস্কৃতি গ্রীক উপনিবেশগুলিতেও চালু ছিল। তারা একই গ্রীক দেব-দেবীর পূজা করতো এবং গ্রীসের জাতীয় খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো।

গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পার্টা, কোরিন্থ ও থিবস। এই সব অঞ্চলের আইনকানুন, শাসন নিয়ম সবই ছিল আলাদা। কোরিন্থ যোজকের উত্তরে এটিকায় প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছিল এথেন্স। কোরিন্থ যোজকের দক্ষিণে পেলোপেনেসাসে প্রধান নগর-রাষ্ট্র ছিল স্পার্টা। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে পার্থক্য ছিল দুস্তর।

কলাশিল্পের দেবী এথেনার নাম অনুসারেই হয়েছিল এই নগর-রাষ্ট্রের নাম হয় এথেন্স। এথেনাই ছিলেন এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীক শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল এথেন্স। এখানে গ্রীসের অন্যান্য সকল নগর-রাষ্ট্রের মতোই গোড়ার দিকে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। পরে কিছুদিন এখানে অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসন প্রচলিত হয়, রাজতন্ত্র লোপ পায়। কিন্তু এথেন্সের নাগরিকরা দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতারাই—টাইরেন্টরা—এথেন্সের শাসক হয়ে ওঠেন। টাইরেন্টরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তাই এথেন্সে মূলতঃ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। গণতন্ত্র ছিল এথেন্সের রাজনৈতিক আদর্শ।

এথেন্স



দেবী এথেনা

এথেন্সে শিশু-শিক্ষার ভার পিতা-মাতার ওপর ছিল না, সে ভার নিতেন শিক্ষাগুরু নিজে। তাঁদের নিজস্ব শিক্ষালয় ছিল। সেখানে শিক্ষাগুরু ছেলেদের প্রথমে লেখাপড়া শেখাতেন। তারপর শেখাতেন দেশের ইতিহাস, গ্রীকজাতির বীরত্বের কাহিনী, গাথা, কবিতা আর সেই সঙ্গে গান ও বেহালা বাজানো। এইভাবে শিক্ষার ভেতর দিয়ে ছেলেদের মনে জাগিয়ে তুলতেন দেশপ্রেম। তাছাড়া সুস্বাস্থ্য ও মনের আনন্দের জন্য কুস্তি-কসরত আর ছবি

আঁকাও শেখাতেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হতো নিজের নিজের পরিবারের মধ্যে। গৃহস্থালির কাজের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হতো। সেই সঙ্গে তারা শিখতো লেখাপড়া, সুতাকাটা, কাপড় বোনা ও এমব্রয়ডারীর কাজ। গান-বাজনাও কিছু কিছু শেখানো হতো তাদের।

এথেন্সের জীবনযাত্রা

চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছিল ছেলেদের শিক্ষার কাল। ব্যায়ামের দ্বারা সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ গঠনের জন্যে আরও দু'বছর নির্দিষ্ট ছিল। তারপর দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে নাগরিকবিধি ও যুদ্ধনীতি শিখে আঠারো বছর বয়সে তারা যোগ দিতো নগররক্ষী দলে। তখন নগর সীমান্তে থেকে তাদের নগর রক্ষা করতে হতো। এইভাবে তেইশ বছর বয়সে তারা উপযুক্ত নাগরিক বলে গণ্য হতো। তখন তারা শাসনকাজে যোগদানের অধিকার লাভ করতো। তাদের হাতে থাকতো প্রচুর অবসর সময়। এথেন্সের লোকেরা হাটে-বাজারে গল্প-গুজব করে তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করতো। আজকের দিনের মত সে যুগে খাওয়া পরার চিন্তায় কাউকেই বিশেষ মাথা ঘামাতে হতো না। বিকেল বেলা রাজদরবারে মিলিত হয়ে রাজকার্যে সাহায্য করতো, কেউ বা আবার বিচারসভায় জুরির আসনে বসে বিবাদ বিসংবাদ মেটাতো।

রাজ্যের মধ্যে রাজা ছিলেন একাধারে প্রধান সেনপতি, প্রধান বিচরক ও প্রধান পুরোহিত। এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও রাজা কিন্তু নিজের খুশীমত চলতে পারতেন না। 'সমিতি' ও 'জনসভার' পরামর্শ নিয়ে তাঁকে সব কাজ করতে হতো। 'সমিতি' গঠিত হতো নগরের গণ্যমান্য লোকজনকে নিয়ে আর 'জন-সভার' সভ্য ছিল নগরের প্রত্যেকটি স্বাধীন নাগরিক। 'সমিতির' সঙ্গে পরামর্শ করে যা ঠিক হোত তাতেও 'জনসভার' মতামত নিতে হোত।

স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল এর ঠিক বিপরীত। যখন গ্রীকরা বাহুবলে স্পার্টায় অধিকার বিস্তার করেছিল, তখন তারা পূর্বের অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। স্পার্টায় স্বাধীন নাগরিকের তুলনায় ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল খুব বেশি—প্রতি স্বাধীন নাগরিকের ছিল বিশজন ক্রীতদাস। এক-বার এইসব ক্রীতদাস প্রচণ্ড বিদ্রোহ করেছিল। স্পার্টানরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও ঐরূপ ভয়ংকর বিদ্রোহ আবার কখন দেখা দেয়, সেই ভয়ে তারা সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলাকে বিদায় জানিয়ে বাহুবল-অর্জনেই আত্মনিয়োগ করেছিল।

স্পার্টা

শিশুকাল থেকেই স্পার্টান বালকদের সামরিক শিক্ষায় নিযুক্ত করা হতো। দুর্বল শিশু জন্মালে তাকে মেরে ফেলা হতো। সাত বছর বয়সে স্পার্টান বালককে সেনানিবাসে শিক্ষালাভের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তাদের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্যে তাদের নিয়মিত চাবকানো হতো। তাদের দেহকে বলিষ্ঠ ক'রে তোলার জন্যে তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং নিষ্ঠুর খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখা হতো। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা এদের নিজস্ব বিচার বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি লোপ ক'রে দেওয়া হতো। এদের চুরি করতে উৎসাহ দেওয়া হতো, কিন্তু ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। স্পার্টানদের মতে, চুরি করা অপরাধ নয়, ধরা পড়াই অপরাধ। এদের জীবনে সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। শক্তি, সাহস, শৃঙ্খলা, বিনা বিচারে আদেশ পালন এবং নৃশংসতা ছিল এদের জীবনের আদর্শ। মানুষের মনের উন্নতির দিকে এতটুকু নজর ছিল না তাদের। তাদের সুন্দর ও সুগঠিত দেহের ভেতর লুকনো ছিল এক কদর্য বর্বর মন। তাই তারা শুধু যুদ্ধজয়ই করে গেছে, গ্রীক সভ্যতার মূলে কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেনি।

স্পার্টা গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। সেখানে রাজার শাসন বা রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। একজন রাজা পাছে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তাই দুজন রাজা থাকতেন। অভিজাত সম্প্রদায় খুবই প্রবল ছিল।

সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্ন হওয়ায় এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধ ও রেষারেষি ছিল। অনেকগুলি গ্রীক নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের অনুগত ছিল, আবার অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্র অনুগত ছিল স্পার্টার। তাই বাইরের শত্রুর আক্রমণের সময়েও গ্রীকরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারতো না।

এথেন্স ও স্পার্টার বিরোধ

ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব-উপকূলে এশিয়া মাইনরে যেসব গ্রীস রাষ্ট্র ছিল, পারস্য সেগুলি অধিকার করেছিল। ঐসব গ্রীক রাষ্ট্র বিদ্রোহ করলে এথেন্স তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। পারস্য-সম্রাট দরায়ুস এই বিদ্রোহ দমন করলেন এবং এথেন্সকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। খৃীস্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে প্রায় চাল্লিশ হাজার পারসিক সৈন্য ঈজিয়ান সাগর পার হয়ে এথেন্সে এসে পৌঁছল। এথেন্স স্পার্টার সাহায্য চাইল। কিন্তু স্পার্টা নির্বিকার রইল। তবু এথেন্সর নাগরিকরা আত্মসমর্পণ করল না। মিলটিয়াডিস নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে এথেন্স-বাহিনী পারসিক বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্যে মারাথনের

প্রান্তরে এসে সমবেত হলো। তারা সংখ্যায় পারসিক বাহিনীর অর্ধেক ছিল। তবু তাদের দেশপ্রেম ও শৌর্য মারাথনের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীকে পরাস্ত করলো। পারসিক বাহিনী দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

মারাথনের রণক্ষেত্র থেকে এথেন্স শহরের দূরত্ব ছিল প্রায় পঁচিশ মাইল। এই দীর্ঘপথ প্রাণপণে একটানা ছুটে একজন সৈনিক এই বিজয়বার্তা এথেন্সে পৌঁছে দিল এবং বিজয়বার্তা ঘোষণা ক'রেই মারা গেল। এইভাবে দীর্ঘপথ একটানা প্রাণপণ দৌড় থেকেই মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার নামকরণ হয়েছে।

মারাথনের যুদ্ধে জয়ী হ'লেও এথেন্স জানতো, এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নয়। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে পারস্যও প্রস্তুত হতে লাগলো। এথেন্সও নিজেকে প্রস্তুত করে তুললো। পূর্বের তুলনায় সে নিজেকে নৌ-শক্তিতে অনেক বলীয়ান ক'রে তুললো। ইতিমধ্যে দরায়ুসের মৃত্যু হয়েছিল। দরায়ুসের পুত্র জেরেক্সিস মারাথন যুদ্ধের দশ বছর পরে চার লক্ষ সৈন্য ও বারো শ' যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে গ্রীস অভিযান করলেন। এথেন্স অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সাহায্য চাইলো। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য গ্রীক-রাষ্ট্রের সঙ্গে স্পার্টাও পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধে অগ্রসর হলো। স্পার্টার রাজা লিওনিডাস কিছুসংখ্যক বাছাই-করা সৈন্য নিয়ে থার্মোপাইলির সংকীর্ণ গিরিপথে পারসিক বাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলেন। লিওনিডাস ও তাঁর সৈন্যরা যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখালেন, তা' ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো। তাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে অগণিত শত্রুসেনা বধ ক'রে দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। কিন্তু পারসিক বাহিনীকে প্রতিরোধ করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হলো না।

পারসিক বাহিনী এথেন্স অধিকার ক'রে শহরে আগুন লাগিয়ে দিল। তবু এথেন্স শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করলো না। স্থলে গ্রীক বাহিনী পরাজিত হ'লেও এথেন্সের নৌবাহিনী সালামিস ও মাইকেলের যুদ্ধে পারসিক নৌবহরকে বিধ্বস্ত করলো। নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জেরেক্সিস গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পারসিক বাহিনী প্লাটিয়ার যুদ্ধেও পরাজিত হলো। এথেন্সের নৌশক্তি গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করায় সারা গ্রীসে এথেন্সের মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। এথেন্সের নেতৃত্বে ঈজিয়ান সমুদ্রের ও এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাষ্ট্রগুলি একটি সংঘ গ'ড়ে তুললো। ফলে এইসব গ্রীক রাষ্ট্রের উপর এথেন্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

এথেন্সের এই শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে স্পার্টা ঈর্ষান্বিত হলো। স্পার্টার

নেতৃত্বে অবশেষে দক্ষিণ গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হলো এবং এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এই যুদ্ধ পেলোপনেসীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ প্রায় সাতাশ বছর ধরে চলেছিল। যুদ্ধের শুরুতে এথেন্সে এক মহামারী হয় এবং মহা নায়ক পেরিক্লিসের মৃত্যু ঘটে। যুদ্ধে স্পার্টার কাছে এথেন্স পরাজিত হলো এবং গ্রীসে তার আর প্রাধান্য রইল না।

পেলোপনেসীয় যুদ্ধ

গ্রীসে স্পার্টার প্রাধান্যও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। প্রায় পঁচিশ বছর পরে থিবিস নগর-রাষ্ট্রের হাতে স্পার্টার পরাজয় ঘটলো। কয়েক বছর পরে থিবিসেরও পতন হলো। এইভাবে গ্রীসে আর কোন শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্র রইলো না।

সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এথেন্সের দান

মানব-সভ্যতায় গ্রীসের দান অতুলনীয়। গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এথেন্সে। এথেন্সের সুবিখ্যাত নায়ক পেরিক্লিসের শাসন-কালই ছিল এথেন্সের সুবর্ণ যুগ। তিনি এত বেশী শ্বেতপাথরের অট্টালিকা ও সৌধ নির্মাণ করেছিলেন যে তাঁর যুগকে শ্বেতপাথরের যুগ বলা হয়। পেরিক্লিস ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী। পেরিক্লিস এথেন্সকে কেবল প্রাসাদে, মন্দিরে, মূর্তিতে সুশোভিত করেননি, তিনি এথেন্সকে ক'রে তুলেছিলেন—তাঁর নিজের ভাষায়—গ্রীসের শিক্ষালয়। তাই এই সময়ে শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে এথেন্স অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছিল।

গ্রীসের সুবর্ণ যুগ


পেরিক্লস

এথেন্স এই যুগে নাট্যসাহিত্যে অভাবনীয় উন্নতি করেছিল। ঈস্-কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস বিয়োগান্ত নাটকে এবং এরিস্টোফেনিস মিলনান্ত নাটকে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এই যুগে এথেন্সে বহু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে

সক্রেটিস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রশ্নোত্তরের ছলে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করতেন। তিনি পথে পথে ঘুরে তরুণদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। তিনি মনে করতেন এই সব আলোচনার ফলে সাধারণ লোক সত্য পথ ও সত্য ধর্মকে চিনতে পারবে। তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারকে এমনভাবে আঘাত করেছিলেন যে, তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি হেমলক লতার তীব্র বিষ রস পান ক'রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা অমর হয়ে আছে। তাঁর শিষ্য প্লেটো তাঁর চিন্তাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে যান। প্লুটো নিজেও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন; বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল তাঁর ছাত্র ছিলেন। অ্যারিষ্টটল ছিলেন আবার বীর আলেকজাণ্ডারের গুরু।

সাহিত্য

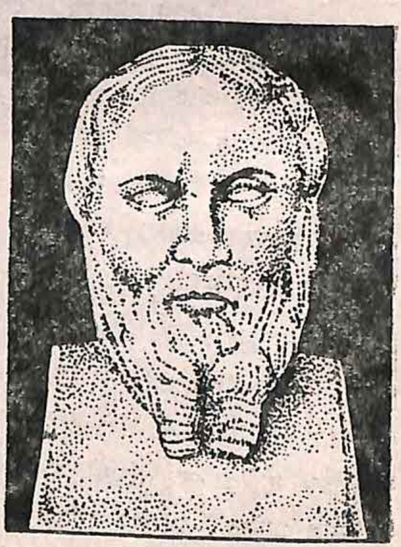
দর্শন



সক্রেটিস

এই যুগেই পৃথিবীতে প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডটাস। হেরোডটাসকে **ইতিহাসের জনক** বলা হয়। পারস্যের সঙ্গে গ্রীসের যুদ্ধ-কাহিনী তাঁর ইতিহাসের প্রধান বিষয় হ'লেও তিনি নানা প্রাচীন দেশ ও জাতির কথাও লেখেন। তাঁর পরে থুকীদীদস রচনা করেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ।

ইতিহাস

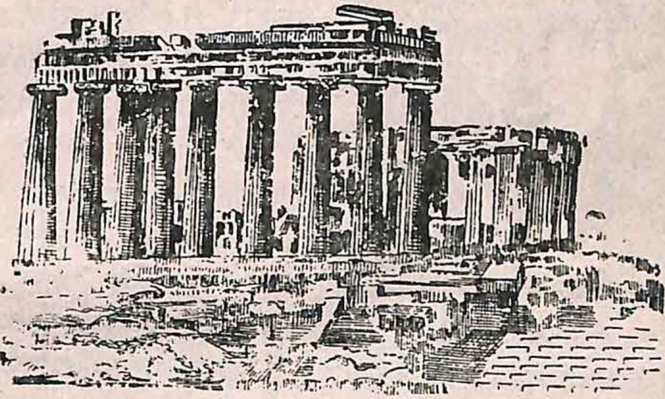


হেরোডটাস

স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রকলাতেও এথেন্স ওই সময় যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল, তার তুলনা নেই। পারস্য-সম্রাট জেরেক্সিস এথেন্স নগরীকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

পেরিক্লিস পুনরায় এথেন্সকে সুরম্য প্রাসাদে, মন্দিরে ও মূর্তিতে সুশোভিত ক'রে তোলেন। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার মন্দির পার্থেনন বিখ্যাত স্থপতি ইকটিনাসের অমর কীর্তি। ফিডিয়াস এথেনা দেবীর এক অপূর্ব মূর্তি নির্মাণ করেন। অন্যান্য

শিল্পকলা



পার্থেনন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

বহু শিল্পীও এথেন্সকে প্রাসাদে, মন্দিরে ও মূর্তিতে সুসজ্জিত করেন।

॥ ম্যাসিডনের অভ্যুদয় ॥

স্পার্টা ও এথেন্স দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছিল এবং এই সুযোগে গ্রীসের যেসব রাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল তাদের মধ্যে উত্তরের রাজ্য ম্যাসিডন অন্যতম। খৃষ্টপূর্ব ৩৫৯ অব্দে ফিলিপ ম্যাসিডনের রাজা হ'ন। তিনি এক অপরাজেয় সৈন্যদল গড়ে তোলেন এবং তার সাহায্যে সমগ্র গ্রীসদেশ জয় করেন। গ্রীস জয় করার পর ফিলিপ পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা আঁটতে আরম্ভ করেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সে স্বপ্ন সফল হলো না।

ফিলিপ

ফিলিপের মৃত্যুর পরে ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার। ছোটবেলা থেকে আলেকজাণ্ডার গ্রীক পণ্ডিতদের কাছে গ্রীক সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা পান। বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল ছিলেন তাঁর গৃহ শিক্ষক। সমরবিদ্যায়ও আলেকজাণ্ডার ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।

আলেকজাণ্ডার

রাজা হওয়ার পর আলেকজাণ্ডার পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিল চল্লিশ হাজার সৈন্য—পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার মিলে। হেলেসপণ্টের ওপারে ছিল পারসীক সাম্রাজ্য। পারসীকদের তৈরী প্রশস্ত পাথুরে সড়ক দিয়ে গ্রীকসৈন্য-সামন্ত চলে এশিয়ায়। ৩৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে, সাত বছর পরে তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে পেঁছোন। এই সাত বছরে তিনি গ্রীকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিনিসিয়া ধ্বংস করেন। মিশর তাঁর পদানত হয়। অবশেষে পারস্যরাজ দরায়ুসকে পরাজিত



আলেকজাণ্ডার

করে আলেকজাণ্ডার পারসীক সাম্রাজ্যের দু'টি রাজধানী সুসা ও পার্সিপোলিস ধ্বংস করেন। পারসীক সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ

পার্সিপোলিস থেকে গ্রীক-সৈন্যরা চললো পূর্বমুখে। পথে মধ্য এশিয়ায় শকদের দেশ দখল করে হিন্দুকুশ পর্বতের কাছে হাজির হলেন আলেকজাণ্ডার। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোন বড় রাজ্য ছিল না ; বহু ছোট-ছোট নগররাষ্ট্র ছিল। এদের মধ্যে তক্ষশীলার রাজা অম্ভি এবং ঝিলম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডের নৃপতি পুরু ছিলেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ; কিন্তু অম্ভি ও পুরুর মধ্যে শত্রুতা ছিল। তাই পুরুকে জব্দ করার জন্য অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ভারত আক্রমণে তাঁকে সবরকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যই আলেকজাণ্ডারের কাছে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিল না। এ্যাস্টাকেনয়, এ্যাস্সানেকয় প্রভৃতি নগরগুলি প্রবল বিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার এগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন। সবচেয়ে প্রবল বাধা পেয়েছিলেন তিনি পুরুর কাছ থেকে। বীরত্বের সঙ্গে লড়েও পুরু হেরে গিয়েছিলেন ; তবে তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গ্রীক সম্রাট তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর আলেকজাণ্ডার তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। বিপাশা নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মহাপরাক্রমশালী নন্দরাজার সাম্রাজ্য। তাঁর শক্তির কথা শুনে গ্রীক সৈন্য-

নগরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়। ভারতের বিজিত অংশে আলেকজাণ্ডার যে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অল্প-কাল পরেই সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যের পতন

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গ্রীক সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। সেনাপতি টলেমি পেলেন মিশর। গ্রীস ও ম্যাসিডনে ক্ষমতা দখল করলেন সেনাপতি এ্যাণ্টিপেটার। এ্যাণ্টিগোনাস লাভ করলেন ফ্রিজিয়া ও আরও কয়েকটি রাজ্য। সেনাপতি সেলুকসের ভাগে পড়ে পশ্চিম-এশিয়া।

গ্রীসের আর কোন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না। ম্যাসিডনের সঙ্গে এথেন্স ও অন্যান্য নগররাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদবিসম্বাদ চলতে লাগলো। গ্রীসের রাষ্ট্রগুলির এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে রোম একের পর এক নগরীগুলি জয় করে নিলো এবং ১৬৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমস্ত গ্রীস রোমসাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হলো।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

১। ক্রীট কোথায় অবস্থিত? ক্রীটান সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান?

২। হোমার কে ছিলেন? তাঁর লেখা মহাকাব্যগুলির নাম কর। হোমারীয় যুগ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। গ্রীসে নগর রাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়েছিল কেন? প্রধান দুটি নগর রাষ্ট্রের নাম কর। নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফল কি হয়েছিল?

৪। গ্রীক দেবদেবীর সম্বন্ধে কি জান?

৫। এথেন্সে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা কি ধরনের ছিল?

৬। এথেন্সে রাজা কিভাবে দেশ শাসন করতেন?

৭। স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কি রকম ছিল?

৮। স্পার্টার জনপ্রিয়তা হানি ও এথেন্সের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ কি?

৯। স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম কি? এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১০। এথেন্সের শিল্পী ও নাট্যকারদের পরিচয় দাও।

১১। আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন ? তাঁর ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও।

১২। **টীকা লিখ ঃ**

পেরিক্লিস, সফোক্লিস, সক্রেটিস, হেরোদোতাস।

১৩। **অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—**

(ক) গ্রীকদের সূর্য দেবতার নাম জিউস।

(খ) লাইকারগাস ছিলেন এথেন্সের একজন শাসনকর্তা।

(গ) হেরোদোতাস ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার।

(ঘ) ইস্কাইলাসের বিখ্যাত নাটকের নাম আন্তিগোনে।

(ঙ) সত্যের জন্য সফোক্লিস কারাগারে বিষপান করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

১৪। **ঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য লেখ ঃ**

গ্রীকদের দেবরাজ ছিলেন	পেরিক্লিস
মাইসেনির রাজা ছিলেন	ফিলিপ
এথেন্সের বিখ্যাত টাইরেণ্ট ছিলেন	জিউস
ট্রয়ের রাজপুত্র ছিলেন	আগমেনন
ম্যাসিডনিয়ার রাজা ছিলেন	প্যারিস।

অষ্টম অধ্যায়

রোম

ল্যাটিন, স্যাবাইন ও এট্রাস্কান্—এই তিন জাতির সংমিশ্রণে রোমান জাতির উৎপত্তি। তবে রোমান জাতি উপর ল্যাটিন প্রভাবই সবচাইতে বেশী।

রোমান জাতির উৎপত্তি

ইটালীর পশ্চিম উপকূলের প্রধান নদী টাইবার। টাইবারের বামতীরে মোহনা হতে ১৫ মাইল দূরে কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর রোমনগর অবস্থিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রোম সাতটি পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে। তাই রোমকে বলা হত 'সপ্ত শৈলনগর'।

রোমনগরের জন্ম

কথিত আছে রম্যুলাস ও রেমাস ছিলেন যুদ্ধ দেবতা মঙ্গল ও মা রিহয়া-র যমজপুত্র। রিহয়া-র কাকা এ্যামুলিয়াস রিহয়া-কে হত্যা করে তার পুত্র দুটিকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেয়। প্রথমে এক নেকড়ে বাঘিনী দুধ দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করে। পরে এক মেষপালক তাদের লালন পালন করে। ওরা ভাসতে ভাসতে যেখানে এসেছিল রম্যুলাস পরে সেখানেই রোম নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ সনে)। এ কাহিনী কল্পিত বলেই মনে হয়। প্রবাদ রয়েছে 'রোম একদিনে তৈরী হয় নি।' আসলে রোমও বহুকাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

রোমিউলাস রোমের প্রথম রাজা হ'ন। তারপর তাঁর বংশের কয়েকজন রাজা রোমে রাজত্ব করেন। শেষ রাজার অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে দেশের লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। তখন থেকে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোম ধীরে ধীরে চারিপাশের অন্যান্য দেশ জয় করে বড় হয়ে উঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হতে থাকে। তখন আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ শহরের খুব প্রতাপ। রোম বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে বিবাদ বেঁধে যায়।

রোম ও কার্থেজের যুদ্ধ

কার্থেজ ছিল ফিনিশীয়দের একটি উপনিবেশ। এখন থেকে তিন হাজার বছর আগে ফিনিশীয়দের বাস ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে। ভূমধ্যসাগরের চারদিকের রাজ্যগুলি এবং আরও অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-

বাণিজ্য চলতো। ফিনিশীয়দের মত দক্ষ নাবিক এবং চতুর ব্যবসায়ী সে যুগে আর ছিল না। গ্রীস, ইংলন্ড, ইতালি, স্পেন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে তাদের জাহাজ প্রায়ই যাতায়াত করতো। ভূমধ্যসাগরের তীরে তারা অনেকগুলো শহরও প্রতিষ্ঠা করে। কার্থেজ, মার্সাই, সাইপ্রাস দ্বীপ প্রভৃতি জায়গায় তাদের ঘাঁটি ছিল। কার্থেজের প্রাধান্য উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তর অঞ্চলে স্থাপিত হয়। সিসিলির বৃহত্তর অংশেও কার্থেজের কর্তৃত্ব ছিল; সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা তার দখলে ছিল।

ফিনিশীয় বণিক

৮২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিনিশীয়রা কার্থেজে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করে। পরে সমৃদ্ধি ও সম্পদে কার্থেজ অন্য সব নগরকে ছাড়িয়ে যায়। শহরের মধ্যে আড়াই লক্ষ লোকের বাস, বন্দরে বহু দেশের জাহাজ, উঁচু মন্দির ও প্রাসাদের শিখর দূর থেকে চোখে পড়তো। শহরের দক্ষিণে যেদিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করার ভয় ছিল সেদিকে তিনটি উঁচু প্রাচীর ছিল। শহর রক্ষার জন্য পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে কার্থেজের তুলনা ছিল না।

কার্থেজ

রোমানরা ফিনিশীয়দের 'পিউনিকাস' বলতো; সেইজন্য কার্থেজের সঙ্গে রোমের যে যুদ্ধ হয় তাকে 'পিউনিক যুদ্ধ' বলে। প্রথম পিউনিক যুদ্ধে (২৬৪-২৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কার্থেজের পরাজয় হয়। ফলে কার্থেজকে সিসিলি দ্বীপ রোমের হাতে ছেড়ে দিতে হয় ও অনেক ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকার করতে হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের খুব ক্ষতি হয়। কিন্তু হামিলকার বার্কা নামে কার্থেজের এক সেনাপতি স্পেনের এক অংশ জয় করে সেখানে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। স্পেন দেশের দক্ষিণে সোনা ও রুপোর খনি ছিল। কাজেই অল্প-দিনের মধ্যেই কার্থেজের অবস্থা আবার ভাল হয়ে উঠে। হামিলকার বার্কা-এর মৃত্যু হলে পর সৈন্যরা তাঁর পুত্র হানিবলকে তাঁদের নেতা বলে মেনে নেয়। কার্থেজের পরাজয়ের কথা হামিলকার কখনও ভুলতে পারেননি। হানিবলের বয়স যখন মাত্র ন' বছর, তখন তিনি তাঁকে দেবমন্দিরে নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করান যে, হানিবল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। হানিবল এই অঙ্গীকারের কথা চিরদিন মনে রাখেন।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ

হামিলকার বার্কা

স্পেনের পূর্ব সীমান্তে সেগানটাম নামে একটি শহরের অধিবাসীরা রোমানদের

বন্ধু ছিলেন। হানিবল এই শহর আক্রমণ করলে রোমের সঙ্গে কার্থেজের যুদ্ধ শুরু হয়। একে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ (২১৮-২০২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) বলে। হানিবল তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গম আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালীতে প্রবেশ করেন। 'কানের' যুদ্ধে রোমানরা তাঁর নিকট পরাজিত হয়। সৈন্য কম থাকায় হানিবল রোম আক্রমণ করতে অগ্রসর হননি। অবশেষে হানিবলের ভাই হাসড্রুবাল সৈন্য নিয়ে আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইটালিতে পৌঁছান। রোমানরা বুঝতে পারে যে, হানিবলের সঙ্গে হাসড্রুবাল মিলিত হলে কার্থেজের সৈন্যদের আর বাধা দেওয়া যাবে না। তাই তারা পূর্বেই হাসড্রুবালকে আক্রমণ করে হারিয়ে দেয়। যুদ্ধে হাসড্রুবাল নিহত হন এবং এই সঙ্গে হানিবলের রোম জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ



হানিবল

রোমানরা ভাবলো, হানিবলের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো কার্থেজ আক্রমণ করা। তাহলে হানিবলকে নিজের দেশ রক্ষা করবার জন্য ইটালী ছেড়ে চলে যেতে হবে। রোমান সেনাপতি সিপিও সমুদ্র পার হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করেন। কার্থেজ রক্ষা করবার জন্য হানিবলের ডাক পড়ে। রোম বিজয় অসমাপ্ত রেখে হানিবল দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ন। কার্থেজের কাছে জামা নামক স্থানে হানিবলের সঙ্গে সিপিওর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ে কার্থেজের সর্বনাশ হয়। রোম স্পেনের রাজ্য ও ভূমধ্য-সাগরের দ্বীপগুলি অধিকার করে নেয়। কার্থেজের অধিবাসীরা প্রতি বছর রোমকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করে। রোমান সৈন্যরা কার্থেজের প্রায় পাঁচশ, যুদ্ধ জাহাজ পুড়িয়ে দেয়।

হাসড্রুবাল

জামার যুদ্ধ

রোমের সঙ্গে কার্থেজের সন্ধি পঞ্চাশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়। তারপর আবার যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধকে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ (১৪৯-১৪৬ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) বলে। কেটো নামে রোমের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি একবার কার্থেজে যান। ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বের মত চলছে এবং কার্থেজের আবার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে তিনি বিস্মিত হন। তাঁর মনে হয়, ভবিষ্যতে রোমের আবার বিপদ আসতে পারে।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ

রোমে ফিরে তিনি সকলকে কার্থেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। তিনি যে বিষয়েই রোমের সেনেটে বক্তৃতা দিতেন তার শেষে বলতেন, "কার্থেজকে ধ্বংস করতে হবে।" অবশেষে সন্ধির সর্ত পালন করা হচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে রোমানরা কার্থেজ আক্রমণ করে। চার বছর অবরোধের পর তারা কার্থেজ অধিকার করে ধ্বংস করে ফেলে। কার্থেজ শহর প্রথমে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে ফেলা হয়। কার্থেজ শহরের আর কোন চিহ্ন থাকে না।

কার্থেজের ধ্বংস

রোমান রাষ্ট্রের ভিত্তি পরিবার। পরিবারে পিতাই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। পরিবারের ক্রীতদাস ও সন্তানদের উপর পিতার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। প্রাচীনকাল থেকে রোমের জনসাধারণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা প্যাট্রিসিয়ান এবং গরীব বা সাধারণ মানুষেরা প্লিবিয়ান নামে পরিচিত ছিল। প্যাট্রিসিয়ানরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেতো আর প্লিবিয়ানরা বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্লিবিয়ানরা যোগ দিতে পারতো না; প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে প্লিবিয়ানদের বিবাহ সম্ভবপর ছিল না। প্লিবিয়ানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল না। প্যাট্রিসিয়ানরাই কনসাল, ম্যাজিস্ট্রেট ও উচ্চপদস্থ পুরোহিত হতো। রাজতন্ত্রের অবসানের পর রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে দু'জন কনসাল দেশ শাসন করতেন। প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্য থেকে প্রতি বছর দু'জন কনসাল নির্বাচিত হতেন। কনসালদের পরামর্শ দেবার জন্য ছিল সেনেট। সেনেট ছিল অভিজাতদের সভা। প্লিবিয়ানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি নতুন পদের সৃষ্টি করা হয়। তাকে ট্রিবিউন বলা হতো। প্রতি বছর দু'জন ট্রিবিউন নির্বাচন করা হতো।

রোমান সমাজ ব্যবস্থা

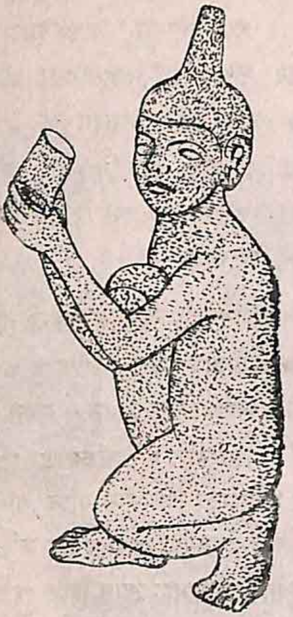
শ্রেণীবিভাগ

প্রথমে রোমের প্রত্যেক নাগরিকদের শাসন সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার ছিল না। সে অধিকার ভোগ করত কেবল অভিজাত শ্রেণী। পরবর্তীকালে অবশ্য ট্রিবিউনরা প্লিবিয়ানদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রথম দিকে প্যাট্রিসিয়ানরা পূর্ণ নাগরিকের অধিকার ভোগ করলেও পরে প্লিবিয়ানরা সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে।

রোমের নাগরিক

রোমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান কলঙ্ক ছিল দাস-প্রথার

ব্যাপক প্রচলন। দিকে দিকে সামরিক অভিযান চালনা করে রোম ক্রমশঃ নিজের রাজ্যসীমা বাড়িয়ে চলছিল। বিজিত রাজ্যের বহু অধিবাসী যুদ্ধ-বন্দী অবস্থায় থাকার পর দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়।

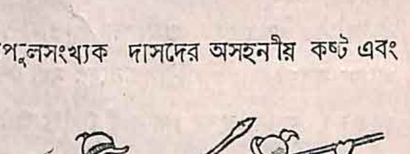


রোমান ক্রীতদাস

ক্রীতদাস প্রথা

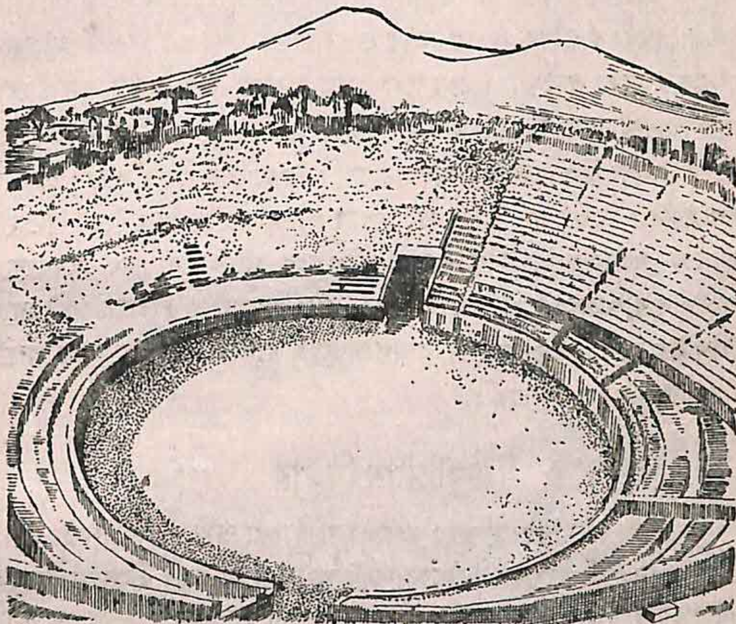
ক্রীতদাস পিতা-মাতার সন্তানরাও ক্রমশঃ দাসদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলছিল। জমিজমা চাষ-আবাদের জন্য প্রচুর সংখ্যক দাস নিয়োগ করা হতো। ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৃহকর্মের জন্যেও দাসদের প্রয়োজন হতো। যে সব খনিতে পাথর পাওয়া যেতো সেই সব খনিতে কাজ করার জন্যও বহু দাসদাসী খাটানো হতো। বেতনভুক শ্রমিকদের পরিবর্তে ক্রীতদাস নিয়োগ বেশী লাভজনক এই অভিজ্ঞতা থেকে জমি, খনি ও কারখানার মালিকরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় দাস নিয়োগে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

সবরকম স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত বিপুলসংখ্যক দাসদের অসহনীয় কষ্ট এবং অভাব অভিযোগের মধ্যে দিন কাটাতে হতো। বয়স্ক দাসদাসী-দের কর্মক্ষমতা কমে যাবে—এই ভয়ে মালিকেরা অনেক সময় তাদের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করে নতুন দাস ক্রয় করতো। যারা দেহের শ্রম এবং কর্মকুশলতা দিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় মালিকদের সেবা করে এসেছে তাদের প্রতি মালিকদের কোন কর্তব্যবোধ ছিল না। অনায়াসে গরু, ঘোড়া, ভেড়ার মতো এদের কেনবেচা ছিল সে-যুগের সাধারণ ঘটনা। সারিসারি খুপরির মতো ছোট ছোট ঘরে, যেখানে



গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই

সূর্যের আলো অথবা মুক্ত বাতাসের প্রবেশাধিকার ছিল না সে রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, অনেক সময় শৃঙ্খলিত অবস্থায় ক্রীতদাসদের এক সঙ্গে পশুর মতো জীবন যাপন করতে দেখা যেতো। ক্রীতদাসদের লড়াই শেখানোর জন্য অনেক শিক্ষালয় খোলা হয়। লড়াইয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের বলা হতো গ্ল্যাডিয়েটর। গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে এই লড়াই



এম্ফিথিয়েটার

দেখার জন্য দেশে বড় বড় প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়। এই সব প্রেক্ষাগৃহ ছিল বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা এবং এক সঙ্গে হাজার হাজার লোক বসে লড়াই দেখতো। এগুলিকে বলা হতো এম্ফিথিয়েটার ও কলোসিয়াম। দুজন ক্রীতদাসকে তরোয়াল হাতে নামিয়ে দেওয়া হতো। দুজন হানাহানি করে যে জয়ী হতো তাকে আবার ফেলে দেওয়া হতো সিংহের সামনে। সিংহের সঙ্গে তার তখন লড়াই চলতো। সিংহ যখন তার রক্তাপ্লুত দেহটি ছিঁড়ে খেতো তাই দেখে হাজার হাজার দর্শক আনন্দে ফেটে পড়তো।

এই অবস্থায় নির্যাতিত দাসদের মধ্যে বিক্ষোভ খুব স্বাভাবিক ছিল। এই

বিক্ষোভের ফলে তারা অনেক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। এই সব বিদ্রোহের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে পরিচালিত এক সশস্ত্র বিদ্রোহ (খ্রীঃ পূঃ ৭৩-৭১)। স্পার্টাকাস ছিলেন মল্লযোদ্ধা। দাসত্বের অপমান এবং নির্যাতন হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে এই বিদ্রোহের যোগদান করে মাত্র একশ' সহচর। ক্রমে ইটালির বিভিন্ন অঞ্চল হতে এক লক্ষ দাস বিদ্রোহী দলে যোগদান করলে রোমের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। পর পর তিনবার অভিযান চালিয়ে রোমের বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। বিজয়ী সশস্ত্র দাসবাহিনী ক্রমে দক্ষিণ ইটালি হতে অগ্রসর হয় রোম অভিমুখে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজধানী অধিকার করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। সেনাপতি ক্রেসাসের নেতৃত্বে পরিচালিত রোমক বাহিনী বিদ্রোহী সৈন্যদের পরাজিত করে তাদের রোম অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। স্পার্টকাস যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেন। প্রায় ছয় হাজার ক্রীতদাস বন্দী হয়। দক্ষিণ ইতালির প্রধান রাজপথ অ্যাপিয়সওয়ের দুধারে ক্রুসবিদ্ধ করে বন্দী ক্রীতদাসদের হত্যা করা হয়।

দাস বিদ্রোহ

জুলিয়াস সিজার

স্পার্টাকাস-এর বিদ্রোহে যখন রোমের নাগরিকরা ভীত ও আতঙ্কিত, তখন রোমের সেনেট-এর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখল করার কাজে মত্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনজন সেনাপতি রোমের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন। তাঁদের নাম পম্পে, ক্রাসাস এবং জুলিয়াস সিজার। এই তিনজনের শাসনকে বলা হয় ত্রয়ী-শাসন।

ত্রয়ী শাসকদের মধ্যে জুলিয়াস সিজার ছিলেন সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল। তিনি কন্সাল নির্বাচিত হয়েছিলেন। কন্সাল রূপে সিজার কিছু কিছু গণতান্ত্রিক কাজ করেছিলেন।

কিন্তু সিজার বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাধারণ লোকের সাহায্য নিয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। সেজন্য চাই সৈন্যবাহিনী। নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সিজার গলদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সেখানে গেলেন। গল-এর সব অংশ রোমের অধিকারভুক্ত ছিল না। সেনেট সে অংশ জয়ের জন্য সিজারকে অনুমতি দিলো। সিজার এই সুযোগের অপেক্ষাতেই

ছিলেন। সেনেট-এর অনুমতি লাভ করে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুললেন।

জুলিয়াস সিজারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

সাত বছর ধরে যুদ্ধ করে জুলিয়াস সিজার সমগ্র গল দেশ জয় করেন। পরে সিজার ঈজিপ্ট, পন্টাস এবং নুমিডিয়াও জয় করেছিলেন। একবার তিনি অভিযান করে ব্রিটেনে পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছিলেন। এইসব অভিযানের ফলে বাইরের প্রচুর অর্থ ও সম্পদ রোমে এলো। রোমে সোনার দাম খুব কমে গেলো। জনসাধারণ সিজারের বীরত্বে ও কৃতিত্বে খুব খুশী হলো।

এবার জুলিয়াস সিজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হওয়ার সময়। তিনি জনসাধারণের সমর্থন নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির কাজে লাগালেন। ত্রয়ী শাসকদের মধ্যে ক্রাসাস এবং পম্পে আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অতএব সিজারকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। সিজার রোমের সর্বেসর্বা হলেন। তখন তাঁর ক্ষমতা অসীম। জনগণের সমিতি সিজারের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হতো। সিজার সম্রাট হবেন এমন কথাও শোনা গেলো।


জুলিয়াস সিজার

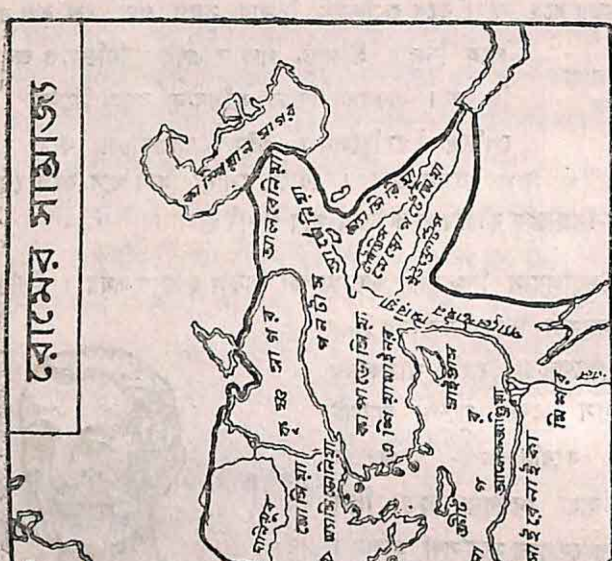
সিজারের মৃত্যু

সিজারের এত ক্ষমতাস্পৃহা সেনেট-এর সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিরক্তি সৃষ্টি করলো। ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস-এর নেতৃত্বে সেনেট-এর একদল সদস্য সিজারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হলো। চক্রান্তকারীরা সেনেটে সিজারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করলো (৪৪ খৃঃ পূঃ)।

রোম ও সাধারণতন্ত্রের বিলুপ্তি

চক্রান্তকারীদের হাতে জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। চক্রান্তকারীদের নেতা ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস পালিয়ে গেলো। রোমে দ্বিতীয়বার ত্রয়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। এবারে শাসনকর্তা হলেন লিপিডাস, মার্ক এ্যান্টনি এবং জুলিয়াস সিজারের পালিত পুত্র অক্টেভিয়ান সিজার। ত্রয়ী শাসকগণ যুদ্ধে ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসকে পরাজিত ও নিহত করলেন।

এই ঘটনার পর অক্টেভিয়ান তাঁর পিতার মতো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দখল করতে চাইলেন। লিপিডাস-এর নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না। অতএব



অক্টেভিয়ান-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রইলেন মার্ক এ্যাণ্টনি। মার্ক এ্যাণ্টনি ঈজিপ্টে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

অক্টেভিয়ান ঈজিপ্ট অভিযান করে ঈজিপ্টকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত

করেন। মার্ক এ্যাণ্টনি আত্মহত্যা করলেন। অক্টেভিয়ান-এর পরাক্রমে বিমুগ্ধ সেনেট-এর সদস্যগণ অক্টেভিয়ানকে সম্মানসূচক উপাধি দিলেন আগস্টাস (২৭খৃঃপূঃ)। সেনেট আগস্টাস সিজারকে প্রচুর ক্ষমতা দিলো। আগস্টাস হলো রোমের প্রধান সেনাপতি। তাঁর আর একটি উপাধি হলো সম্রাট।

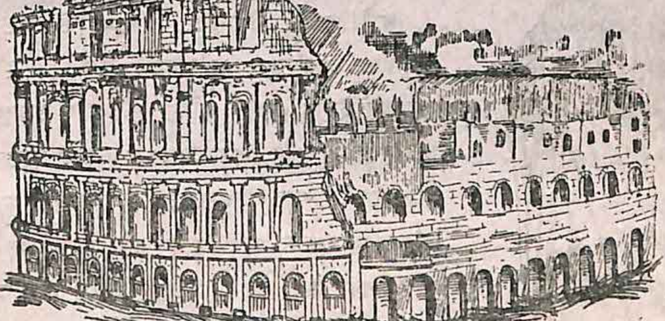
রোমের প্রথম সম্রাট

আগস্টাস সিজারের শাসনকালে জনসাধারণের প্রতি তাঁর নীতি "রুটি ও সার্কাস" নীতি বলে পরিচিত। বিনা পয়সায় রুটি বিলি করে এবং সস্তা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে আগস্টাস জনগণকে তাঁর পক্ষভুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা তিনি আর্মেনিয়া ও বসফোরাস-এর উপর রোমের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। আগস্টাস সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারনীতি প্রয়োগ করেন। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।

নতুন সাম্রাজ্য

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমের সম্রাটেরা প্রবল অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। এইরকম একজন সম্রাটের নাম নীরো। নীরো খুব সঙ্গীত-অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রচণ্ড। শোনা যায়, অগ্নিদগ্ধ রোম দেখতে কেমন লাগে এই অদ্ভুত শখ মেটাবার জন্য নীরো রোমে আগুন লাগিয়ে দেন। সাতদিন ধরে এই আগুন জ্বলে। অগ্নিদগ্ধ রোম প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হয়।

সম্রাট নীরো



৭৫-৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত রোমের কলোসিয়াম। এখানে অভিনয় হতো।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তারলাভ করে। এই সময় উত্তর স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে নীলনদ এবং পশ্চিমে আটলাণ্টিক

মহাসাগরের উপকূল থেকে পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। সেই সময় রোম আরব, ভারত এবং চীনের সঙ্গেও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করে। এই দেশগুলি থেকে রোম মসলা, সুগন্ধিদ্রব্য, হাতীর দাঁত এবং রেশম আমদানী করে।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। বিভিন্ন জাতি রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে কঠিন আঘাত করে। রোমের কেন্দ্রীয় সরকার এই সময় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা রকম বিরোধে বিব্রত ছিল। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম দিকে গল, ব্রিটেন এবং স্পেন রোমান শাসন মুক্ত হয়। পূর্ব দিকে পার্মিরা রাজ্যের উত্থান হয়। পার্মিরা রাজ্য রোমের প্রায় সমস্ত পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ হল যে, এই সমাজ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়েছিল। ক্রীতদাস ও গরীব এবং বঞ্চিত কৃষকদের উপর নির্ভর করে রোমের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। এই ক্রীতদাস ও কৃষকরা ছিল মালিকদের উপর অসন্তুষ্ট। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্রীতদাস ও কৃষকরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতো। কখনও কখনও বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করতো। ক্রীতদাস ও কৃষকশ্রেণীর অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করেছিল।

রোম সাম্রাজ্যের পতন



যীশুখ্রীষ্ট

খ্রীষ্টধর্মের উত্থান: যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে খ্রীষ্টধর্ম বলে। যীশু প্যালেস্টাইনের একটি গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা যোসেফ ছিলেন ছুতার। ইতিহাসে যীশুর জন্মসময়টি বিখ্যাত। কারণ তাঁর জন্ম থেকে খ্রীষ্টপূর্ব এবং খ্রীষ্টাব্দ এই কাল গণনা করা হয়। যীশুর ধর্মের মূল কথা ছিল—প্রীতি মানুষ, বিশেষ করে গরিবদের প্রতি ভালবাসা।

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু ক্রীতদাস, কৃষক ও সমাজের গরীব শ্রেণী এই ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সমাজের

উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মীরা উপাসনা মন্দির বা চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। চার্চ ছিল খুব শক্তিশালী সংগঠন। জমি-জমা ও অর্থনৈতিক বিষয়েও চার্চ প্রবল হয়ে উঠে।

এজন্য রোমান শাসকরা প্রথম দিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁরা মত পরিবর্তন করেন। কারণ তাঁরা দেখলেন যে, খ্রীষ্টধর্মে ইহলোকের সুখ অপেক্ষা পরলোকের সুখের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই ধর্মে বিনয়ী হয়ে অত্যাচার সহ্য করার উপদেশও দেওয়া হয়েছে।

রোমান শাসকরা খ্রীষ্টধর্মের এইসব উপদেশের সুযোগ নেন। তাঁরা খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন। বলা হয়, রোমান চার্চ মানুষকে স্বর্গের সন্ধান দেবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন—রোমের সম্রাট।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলীঃ

১। কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয় কেন? পিউনিক যুদ্ধ আলোচনা কর।

২। হানিবল কে ছিলেন? তিনি কিভাবে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন? সেই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল?

৩। প্রাচীন রোমের সমাজে কত রকমের মানুষ বাস করতো? সমাজে ক্রীতদাসদের অবস্থা কেমন ছিল?

৪। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান কাদের বলা হোত? তাদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি?

৫। দেশ শাসনে রোমের নাগরিকদের কি ভূমিকা ছিল?

৬। স্পার্টাকাস কে ছিলেন? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কেন? তাঁর বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

৭। জুলিয়াস সিজারের জীবনী আলোচনা কর। তাঁর নীতি কিভাবে রোম সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করে।

৮। গণতন্ত্রের অবসানের পর রোমের কর্ণধার কে হয়েছিলেন? রোমের জন্যে তিনি কি করেছিলেন?

৯। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

১০। খ্রীষ্টধর্ম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) কার নামে রোম নামকরণ হয়েছে ?
(খ) কিভাবে রোমের ক্রীতদাস সংগৃহীত হতো ?
(গ) ব্রুটাস কে ?
(ঘ) রোম সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর কে ছিলেন ?
(ঙ) সেই নিষ্ঠুর সম্রাটের নিষ্ঠুরতার একটা পরিচয় দাও।
(চ) গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই কাকে বলে ?
(ছ) কনসাল কাদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হোত ? তাদের কাজ কি ছিল ?
(জ) সিপিও কে ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) রোম নগর প্রতিষ্ঠা করেন —।
(খ) হানিবলের পিতার নাম —।
(গ) — আমলে রোমে সোনার দাম খুব কমে যায়।
(ঘ) — খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

টীকা লেখ ঃ

হানিবল, প্রথম পিউনিক যুদ্ধ, ক্র্যাসাস, ব্রুটাস, কেটো, জুলিয়াস সীজার, অগস্টাস সীজার, স্পার্টাকাস, খৃষ্টধর্ম।

———

নবম অধ্যায়

চীন

মিশর ও সুমেরের মত চীনেও প্রথমে অনেক নগররাজ্য ছিল। শাং বা 'য়িন' বংশের এক রাজকুমার টাং প্রায় চার হাজার বছর আগে নগররাজ্যগুলিকে একত্র করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এই বংশের সতেরো জন রাজা ছিলেন। তাঁরা খ্রীঃ পূঃ ১৭৬৬ সাল হতে প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর রাজত্ব করেন। শাংযুগে সভ্যতার খুব উন্নতি হয়। হোনান অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে শাং সম্রাটদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একে বলে 'য়িন'-এর স্তূপ। কচ্ছপের খোলা, হরিণের শিং ও ভেড়ার হাড়ের উপর আঁকা অনেক লিপি ও ছবি, তীর ধনুক ও বর্শা দ্বারা কুকুর, ষাঁড় ও শূকর প্রভৃতি পশু শিকারের ছবি, চিত্রিত মাটির ও এনামেলের পাত্র, চমৎকার ব্রোঞ্জের বাসন-পত্র 'য়িন'-এর ধ্বংসস্তূপ হতে পাওয়া গেছে।

মহান শাং বংশ

শাং বংশের এক অপদার্থ সম্রাটকে বিতাড়িত করে উ-ওয়াং বা উ নামে এক সামন্ত প্রায় তিন হাজার বছর আগে চৌ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের সম্রাটেরা প্রায় নয়শ' বছর রাজত্ব করেন। এই যুগে সামন্তদের ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। তাই চীনের ইতিহাসে এই যুগকে সামন্তযুগ বলে। সামন্তদের তুষ্ট করার জন্য উ কয়েকটি সর্তে সামন্তদের মধ্যে সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ ভাগ করে দেন। প্রত্যেক সামন্ত বিশ বছর বয়সে জমির মালিক হতেন আর ষাট বছর বয়স পর্যন্ত জমি ভোগ-দখল করতে পারতেন। বিনিময়ে সামন্তদের উৎপন্ন ফসলের এক অংশ সম্রাটকে কর হিসেবে দিতে হতো। রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সামগ্রী, রাজপরিবারের পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতিও সামন্তদের সরবরাহ করতে হতো। সামন্ত-দের রাজধানীতে এসে চাষ আবাদের হিসেবপত্র দিতে হতো, ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 'দেবতার পুত্র' সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে হতো। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সম্রাট সামন্তদের জমিদারী পরিদর্শনে যেতেন, দুষ্ট সামন্তদের শাস্তি দিতেন আর শিষ্ট সামন্তদের পুরস্কৃত করতেন। এই যুগে সেচ ব্যবস্থার প্রসার ও জমি ভাগের ফলে কৃষির বেশ উন্নতি ঘটেছিল। বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হয়। চিত্রলিপি বর্ণমালার রূপ পায়।

চীনদেশে এতকাল বহু দেবদেবী, পিতৃপুরুষ ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পুজো প্রচলিত ছিল। চৌ-যুগেই চীনদেশে প্রথম এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার সূচনা হয়। তাকে বলা হতো 'তিয়েন'। এই বংশের রাজত্বকালেই বিখ্যাত চৈনিক ঋষি কনফুসিয়াসের আবির্ভাব ঘটে।

চীনের বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক কনফুসিয়াস ও ভারতের গৌতম বুদ্ধ

ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। চীনের এক নিদারুণ দুঃসময়ে লু প্রদেশে (বর্তমান সাংটুং) এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। লেখাপড়ার সাথে তিনি ধনুর্বিদ্যা ও সঙ্গীত শিখেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতে তিনি একটা আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করা হতো। এই বিদ্যালয়ে এক সময় তিন হাজার ছাত্র পড়তো। এই বিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস এবং নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। তিনি কিছুকাল উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবেও কাজ করেন এবং দেশ শাসনে উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রয়োগের চেষ্টা করেন। স্ত্রী, একমাত্র পুত্র এবং দুই প্রিয় শিষ্যের অকাল মৃত্যুতে তাঁর শেষ জীবন দুঃখময় হয়ে উঠে। দারুণ শোকে ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু চীনের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির উপর তাঁর প্রভাব আজও অপরিসীম। তাঁর সমাধি চীনের তীর্থক্ষেত্র।

কনফুসিয়াস



কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াস ছিলেন কঠোর নীতিবাদী ও প্রাচীনপন্থী। তিনি নতুন সব কিছুরই বিরোধী ছিলেন। রাজা হলেন প্রজাদের পিতা আর প্রজারা হলেন রাজার পুত্র—এই ছিল তাঁর নীতির মূলকথা। তাঁর কয়েকটি স্মরণীয় বাণী—

কনফুসিয়াসের আদর্শ ও উপদেশ

"যিনি গরীব হয়েও তোষামোদ করেন না, ধনী হয়েও দাম্ভিক হন না তিনিই প্রকৃত মানুষ।" "অন্যের যে আচরণে নিজে ব্যথা পাও অন্যের প্রতি সে আচরণ করো না।"

খৃঃ পূঃ ২৪৯ সালে চৌ বংশের শেষ সম্রাটকে বিতাড়িত করে আসল 'চীন' বংশ। এই বংশের নাম থেকেই দেশটির নাম হয় চীন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সি হুয়াং তি (খৃঃ পূঃ ২৪৬-২১০)। তিনি মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার কিছু অংশ জয় করেন। শাসনের সুবিধের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে তিনি ৩৬টি ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর সময় সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়, বহু রাজপথ তৈরী হয় এবং অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই

ধরণের ওজন ও মাপের ব্যবস্থা চালু হয়। অনেকটা সহজীকৃত অভিন্ন চিত্রলিপি প্রচলিত হয়। যাযাবর জাতিদের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিখ্যাত চীনের প্রাচীর নির্মাণের কাজও এই সময় আরম্ভ হয়।

সি হুয়াং তি-র কঠোর শাসনের ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কনফুসিয়াসের শিষ্যেরাও তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। অতি নিষ্ঠুরভাবে তিনি তাদের দমন করেন। কনফুসিয়াসপন্থী ৪৬০ জন পণ্ডিতকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয় এবং সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়। সি হুয়াং তি-র মৃত্যুর অল্প পরেই 'চীন' বংশের উচ্ছেদ ঘটে এবং 'হ্যান' বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।



চীনের প্রাচীর

চীনের প্রাচীর

প্রধানতঃ মোঙ্গলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যই চীনদেশের উত্তর সীমানার অনেকটা অংশ জুড়ে বিশ্ব-বিখ্যাত চীনের প্রাচীর সি-হুয়াং-তি নির্মাণ করেন। বহু যুগ ধরে এই প্রাচীরের নির্মাণকাজ চলেছিল। প্র য় ১২৭৮ মাইল লম্বা এই প্রাচীরটি পূর্বদিকে সমুদ্র থেকে পশ্চিমে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইঁট, পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়। প্রাচীরটি প্রায় ২০ ফুট চওড়া ও ২২ ফুট উঁচু এবং এর মধ্যে মধ্যে রয়েছে ৪০ ফুট উঁচু থাম। এটি মানুষের গঠন শক্তির এক আশ্চর্য নিদর্শন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :

(১) চীনের শাং বংশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(২) কনফুসিয়সের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(৩) চীনের মহাপ্রাচীর কেন তৈরী করা হয়েছিল ? এই প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান ?

দশম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের কথা

মধ্য-এশিয়া থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্তেপ অঞ্চল আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। এরা ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ও উন্নতনাসা বিশিষ্ট। এরা প্রধানতঃ পশুপালক ও যাযাবর ছিল। আবহাওয়া, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব প্রভৃতি নানা কারণে এরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই একটি শাখা ঘুরতে ঘুরতে ইরান হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ নাগাদ।

আর্য জাতি

আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বিরাজ করছিল। আর্যরা ঘোড়া ও লোহার ব্যবহার জানতো। অশ্ব ও লৌহাস্ত্রের ব্যবহার জানার ফলে তারা সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের পরাজিত ক'রে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিড় জাতির লোকেরাই সিন্ধু সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল, এ কথা বলা হয়। আর্যরা প্রথমে ভারতবর্ষের সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সিন্ধু নদী ও তার শাখা-প্রশাখা বিধৌত এই অঞ্চলকে তারা বলতো সপ্তসিন্ধু। এখান থেকে ক্রমশঃ তারা পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে বসতি স্থাপন

আর্যরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে, সেই সময়েই পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র বেদ রচনা শুরু হয়। 'বেদ' মানে জ্ঞান। বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম্, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদ আবার **সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক** ও **উপনিষদ**—এই চার ভাগে বিভক্ত। সংহিতায় দেবতাদের স্তবস্তুতি ও মন্ত্রাদি আছে। এগুলিকে সূক্ত বলা হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতা বেদের প্রাচীনতম অংশ। সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদের বেশির ভাগ সূক্তই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সামবেদ-সংহিতার সূক্তগুলি যাগযজ্ঞের সময়ে গাওয়া হতো। যজুর্বেদ-সংহিতায় সুন্দর ছন্দোময় গদ্য আছে। অথর্ববেদ-সংহিতায় আছে মন্ততন্ত্র ও ডাকিনীবিদ্যা।

চতুর্বেদ

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। এগুলিতে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ডের বিবরণ আছে। সকল বেদেরই ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শেষে আছে আরণ্যক। সংসারত্যাগী অরণ্যবাসীদের জন্য এই অংশ রচিত। বেদের শেষ অংশ উপনিষদ

বা বেদান্ত নামে পরিচিত। এগুলিতে আত্মা, সত্য, সৃষ্টি, ব্রহ্ম প্রভৃতির আলোচনা রয়েছে।

বেদ ধর্মগ্রন্থ ; তবুও এর মধ্যে ছাড়ানো রয়েছে ধর্ম ছাড়া প্রাচীন যুগের সমাজ ও রাজনৈতিকজীবন সম্পর্কে নানা কথা। আর্যরা যখন প্রথম ভারতে আসে তখন তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সমাজে ছিল দু'শ্রেণীর লোক—গৌরবর্ণ বিজেতা আর্য ও কৃষ্ণবর্ণ পরাজিত অনার্য্য।

বৈদিক যুগে আর্য সমাজ

পরে আর্যদের মধ্যে গড়ে উঠে চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন। ক্ষত্রিয়দের উপর ছিল রাজ্যশাসন ও দেশরক্ষার দায়িত্ব। বৈশ্যদের বৃত্তি ছিল কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা বাণিজ্য। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন শূদ্রেরা। উচ্চতর তিনটি বর্ণের সেবা করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে প্রথম তিনটি বর্ণের মধ্যে বিবাহে কোন বাধা ছিল না। আবার এই তিন বর্ণের লোকেরা স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন।

বর্ণ

বৈদিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য—আশ্রম বিভাগ। এই যুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জীবনে ছিল **চারটি ভাগ বা আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস**। প্রথম আশ্রমটিকে বলা হতো **ব্রহ্মচর্য**। এই সময় আর্য বালককে গুরুগৃহে থেকে পড়াশোনা করতে হতো। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য। এই সময়ে গৃহে ফিরে সংসার ধর্ম পালনের বিধান ছিল। তৃতীয় আশ্রমের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে পরিণত বয়সে সংসার হতে দূরে নির্জন জায়গায় অথবা তপোবনে বসবাস করা ছিল বাধ্যতামূলক (**বানপ্রস্থ**)। চতুর্থ এবং শেষ আশ্রমকে বলা হতো **সন্ন্যাস**। এই সময়ে সংসারের সঙ্গে সমস্ত রকম বন্ধন ছিন্ন করে ঈশ্বরের উপাসনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করার নির্দেশ ছিল।

আশ্রম বিভাগ

বৈদিক যুগে নারীরা ছিলেন বিশেষ সম্মানের পাত্র। প্রথম তিন বর্ণের বালিকারা শিক্ষার সব রকম সুযোগ পেতেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক নারী তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী**। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বেদের বহু মন্ত্র রচনা করেন। সে-যুগে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। বিধবাদের পক্ষে কোন কোন

বৈদিক যুগে নারীর স্থান

ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের পথে কোন বাধা ছিল না। স্বামীর সহধর্মিণী হিসেবে মহিলারা যাগযজ্ঞ ও দানধ্যানে অংশ গ্রহণ করতেন।

বৈদিক সাহিত্যে সে যুগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রথম ভাগে বেশীর ভাগ লোকজন বাস করতো গ্রামে। বাড়ীঘর ছাড়া গ্রামে ছিল কৃষির জমি এবং পশু চারণের ক্ষেত্র। সে যুগের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি এবং পশুপালন। জমিকে উর্বর করে তোলার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া ও কুকুর। কৃষি ও পশুপালন ছাড়া ক্রমে আরও কয়েকটি বৃত্তির উদ্ভব ঘটে—এগুলো গড়ে উঠে বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্র করে। ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠে। শিল্পী হিসাবে যাঁরা জীবিকা অর্জন করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চর্মকার, কর্মকার, ধাতুশিল্পী, অলংকার প্রস্তুতকারক, তাঁতী ও ছুতোর। বৈদিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জীবনধারণের আর একটি উপায়।

বৃত্তি

এই যুগের বণিকেরা স্থল ও জল উভয়পথেই ব্যবসা বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিলেন। জলপথে তাঁরা জাহাজ বোঝাই নানাবিধ পণ্য বিদেশে চালান দিতেন। প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্যের আদান প্রদান চলতো বিনিময় প্রথার সাহায্যে। শস্যের বদলে বস্ত্র, বস্ত্রের বদলে অলংকার এই ভাবে চলতো আদান প্রদান। পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। বৈদিক যুগের মুদ্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নিষ্ক, শতমান এবং সুবর্ণ। এই যুগের শেষ ভাগে নগরের পত্তন ঘটতে শুরু করে।

বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল যব বা গমের রুটি, ভাত, শাক-সবজি, পশুপাখীর মাংস, ফলমূল। তাঁদের প্রধান পানীয় ছিল দুধ। তাঁরা

খাদ্য, পরিচ্ছেদ ও খেলাধূলা

পরিধান করতেন কার্পাস ও রেশমের বস্ত্র ও পোষাক। খেলাধূলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রথচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, শিকার, অভিনয় ও নৃত্যগীত। তাঁদের মধ্যে জুয়াখেলারও প্রচলন ছিল বলে মনে হয়।

বৈদিক যুগের আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবী মনে করে উপাসনা করতেন। দেবতাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গের দেবতা দ্যৌঃ, বায়ুর দেবতা মরুৎ;

ধর্ম

বৃষ্টির দেবতা বরুণ। সূর্য, উষা, অগ্নিও ছিলেন আর্যদের উপাস্য। সে-যুগে মূর্তি পূজোর প্রচলন ছিল না। প্রথম যুগে উপাসনার রীতিনীতি ছিল সরল। পরবর্তী যুগে এগুলি জটিল হয়ে

দাঁড়ায় এবং ধর্ম ও সমাজ জীবনে পুরোহিত শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

আর্যরা যখন ভারতে বসতি বিস্তার করে, তখন তাদের একদিকে যেমন অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তেমনি অন্যদিকে নিজেদের মধ্যেও বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এইসব ঘটনা নিয়ে কবিরা কবিতা ও গান রচনা করেন। কোন প্রতাপশালী রাজা যাগযজ্ঞ করলে তখন তাঁরা এগুলি গাইতেন। এইভাবে মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়। সূর্য-বংশীয় রাজাদের গৌরব নিয়ে **রামায়ণ** এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাদের গৌরব নিয়ে **মহাভারত** মহাকাব্য দুখানি রচিত হয়। **বাল্মীকিকে** রামায়ণের এবং **ব্যাসদেবকে** মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়।

মহাকাব্য

মহাকাব্যের যুগে আর্যসমাজে বর্ণভেদের কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পায়। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরশুরাম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। এই যুগেই ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র ও ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ দেবতার আসন লাভ করেন। সমাজে ব্রাহ্মণদের তুলনায় ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

রামায়ণে আর্যদের দক্ষিণ ভারতে অধিকার বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে দেখা যায়, উত্তর ভারতের একটি রাজবংশ সমস্ত ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে। এইভাবে মহাকাব্যগুলিতে একটি আর্য-শাসিত ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা বলা হয়েছে।

অনার্যরা আর্যদের কাছে পরাজিত হলেও সভ্যতায় তারা আর্যদের চেয়ে কম উন্নত ছিল না। ফলে প্রাচীন আর্য সভ্যতায় অনার্য সভ্যতার প্রভাব পড়ে এবং আর্যসমাজে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাকাব্যের যুগে অনার্য দেবতা শিব মহেশ্বররূপে অন্যতম প্রধান দেবতার আসন পান। বৈদিক যুগে যে ইন্দ্র প্রধান দেবতা ছিলেন, মহাক্যব্যের যুগে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতায় পরিণত হন। দেবতাদের মধ্যে বহু পৌরাণিক দেবদেবীও স্থান পান।

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম: বৈদিক যুগে দেবপূজায় যাগযজ্ঞ ও পশুবলি হতো। কিন্তু পরে এইসব আচার অনুষ্ঠানের প্রতি কেউ কেউ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে দু'জন মহাপুরুষ আমাদের দেশে এই রকম নতুন ধর্ম প্রচার করেন তাঁরা হলেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ।

উত্তর বিহারের বৈশালীর নিকটে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। বৈশালীর রাজবংশের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। প্রথমে তাঁর নাম ছিল

বর্ধমান। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। বারো বছর তপস্যা করার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় মহাবীর বা জিন। জিন অর্থ যিনি সংসারের মোহ জয় করেছেন। তারপর ত্রিশ বছর মহাবীর বিহারের অনেক স্থান ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে রাজগৃহের নিকট পাবা নামে এক গ্রামে তাঁর তিরোধান হয়।

মহাবীর



মহাবীর

তাঁর শিষ্যদের প্রথমে বলা হতো নির্গ্রন্থ (সাংসারিক গ্রন্থিবন্ধন বিমুক্ত)। পরে তাঁদের নাম হয় জৈন। জৈন ধর্মে জীবহত্যার মত পাপ আর নেই। অহিংসা, সত্যকথা বলা, পরের জিনিস অপহরণ না করা এবং দারিদ্র ব্রত গ্রহণ এইসবই জৈনধর্মের মূল কথা। খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ায় মহাবীরের প্রচারিত নীতি সমূহকে বিভক্ত করে 'দ্বাদশ অঙ্গে' সাজানো হয়। এর পরে ধর্মীয় প্রশ্নে জৈনদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যান। বর্তমানে গুজরাট ও রাজপুতনায় জৈন সম্প্রদায়ের লোক বেশী দেখা যায়।

গৌতম বুদ্ধ মহাবীরের সমসাময়িক হলেও বয়সে ছোট ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ আমরা জানিনা। নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্য জাতির বাস ছিল। তারা ছিল ক্ষত্রিয়। শুদ্ধোধন ছিলেন তাদের রাজা। তাঁর রাজধানীর নাম কপিলাবস্তু। তারই নিকটে লুম্বিনী গ্রামের উদ্যানে শুদ্ধোধনের পুত্র গৌতমের জন্ম হয়; নামকরণ হয় সিদ্ধার্থ। শৈশবেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। সিদ্ধার্থের স্ত্রীর নাম যশোধরা এবং পুত্রের নাম রাহুল। বাল্যকাল হতেই সিদ্ধার্থের সংসারে আসক্তি ছিল না। এক বৃদ্ধ, এক রুগ্ন ব্যক্তি ও একটি মৃতদেহ দেখে তাঁর বৈরাগ্য আরও গভীর হয়। এক সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি মনে করেন বৈরাগ্যের পথে দুঃখ নিবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যাবে।

বুদ্ধদেব

একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে চলে যান। তারপর শুরু হয় তাঁর কঠোর সাধনা। তিনি ছ' বছর গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামক স্থানে তপস্যা করেন। কিন্তু শরীরকে নিগ্রহ করে তিনি দুঃখ নিবৃত্তির উপায় পেলেন না। মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তির সন্ধান পান। সিদ্ধার্থ সম্যক জ্ঞান বা বোধিলাভ করেন বলে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ।

বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্থানে প্রথমে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি বলেন, বেশী সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা ভাল নয়; শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিয়েও লাভ নেই, এদুয়ের মধ্য-পথ অবলম্বন করা উচিত। তাঁর মতে, বাসনা থেকেই দুঃখ। আট উপায়ে এই বাসনার নিবৃত্তি হয়—সম্যগ্ দৃষ্টি, সৎবাক্য, সৎসংকল্প, সৎজীবন, সৎকর্ম, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এদের বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই অষ্ট মার্গের অনুসরণ করলে মানুষের আর কোন দুঃখ থাকে না। বুদ্ধদেবের একটি প্রধান উপদেশ ছিল কোনও প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নয়; অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করবে।


বুদ্ধদেব

আশি বছর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়) বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয়।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা মিলে তাঁর উপদেশসমূহ সঙ্কলন করেন। পালি ভাষায় লিখিত এই সংগ্রহকে ত্রিপিটক বলা হয়। ত্রিপিটক সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম—এই তিনভাগে বিভক্ত। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের ঘটনা নিয়ে রচিত কাহিনীকে জাতক বলে।

বুদ্ধের তিরোধানের অনেক বছর পরে কয়েকটি প্রশ্নে বৌদ্ধদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে তাঁরা ভাগ হয়ে যান। তাসত্তেও বৌদ্ধধর্ম প্রায় সারা এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। তবে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রায় লোপ পায়।

॥ সাম্রাজ্যের পর্ব ॥

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যবংশের রাজত্বকালে সমগ্র উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

মৌর্যবংশ

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। তিনি নন্দ বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন দখল করেন। আলেকজাণ্ডার ভারত ছেড়ে চলে গেলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তেমন শক্তিশালী আর কোন রাজা ছিলেন না। সুতরাং মৌর্য সাম্রাজ্যের স্রষ্টা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এই অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে বেগ পেতে হয়নি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকস এশিয়াস্থ গ্রীক সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ৩০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তকে হারাতে না পেরে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করেন। বর্তমান আফগানিস্থানের এক বিশাল অংশ সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দেন। প্রতিদানে চন্দ্রগুপ্ত তাকে ৫০০ হাতী উপহার দেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলুকস মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীক দূত প্রেরণ করেন। তাঁর লেখা 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ থেকে আমরা সেই সময়ের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি।

পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলেও কলিঙ্গ অর্থাৎ উড়িষ্যা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক কলিঙ্গ জয় করে চন্দ্রগুপ্তের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন।

সম্রাট অশোক

অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি প্রজাদের নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন। প্রজারা যাতে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ-শান্তি পায় সেইজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পথিকদের বিশ্রামের জন্য ছায়াতরু রোপণ, সরাইখানা স্থাপন, কূপ খনন প্রভৃতি তাঁর জনহিতকর কাজের নিদর্শন। প্রজাদের কল্যাণের জন্য অশোক ধর্মমহামাত্র, রাজুক, যুত, প্রাদেশিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেন।

প্রজারা যাতে সু-নাগরিক হয় তার জন্য অশোক প্রজাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তোমরা প্রাণী-হিংসা করবে না; পিতা, মাতা,

বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, ভৃত্য সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে; সকল দলের সকল মতের লোক পাশাপাশি বাস করবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কথা



শুনবে; ব্রাহ্মণ-শ্রমণকে দান করবে; যে সব কাজে ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা,

হিংসা জন্মে যে সব কাজ করবে না। অশোকের এইউপদেশের প্রয়োজনীয়তা আজও বর্তমান।

অশোক সাম্রাজ্যের সর্বত্র—কোথাও পাহাড়ের গায়ে, কোথাও স্তম্ভ স্থাপন করে তার গায়ে তাঁর বাণী খোদাই করিয়েছিলেন। এগুলি বেশীর ভাগই ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা; আবার কিছু কিছু খোরোষ্ঠী ও আরামেয়িক অক্ষরে লেখা।



অশোক

প্রজারা যাতে তাঁর উপদেশ অনুসরণ করতে পারে সেইজন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ব্রাহ্মীলিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন জেমস্ প্রিন্সেপ।



ব্রাহ্মীলিপি

২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার সারা ভারত জুড়ে বহু রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। মগধে শুঙ্গ বংশীয় নৃপতিগণ সিংহাসন দখল করেন। শুঙ্গ বংশের পর এল কান্ব বংশ। এই সময়ে ব্যাকট্রিয়া থেকে গ্রীস, মধ্য এশিয়া থেকে শক, কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে পহ্লব এবং সব শেষে কুষাণরা একের পর এক ভারতে প্রবেশ করে।

কুষাণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। তারা হিন্দুকুশ পাহাড়

অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। কুষাণদের প্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন কুজুল কদফিসস। তিনি পহ্লবদের পরাস্ত করে কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। কুজুল কদফিসসের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফিসস কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ দখল করে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য

কুষাণ-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। সিংহাসনে আরোহণ করেই কণিষ্ক একটি সম্বৎ প্রচলন করেন। এই সম্বৎকে 'শকাব্দ' বলা হয়ে থাকে। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হতে এই শকাব্দের গণনা চলে আসছে। কণিষ্ক ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি বহু রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কাবুল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মালব ও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি মধ্য-এশিয়ারও অনেক অঞ্চল জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে থাকতেন।


কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে কুষাণদের উচ্ছেদের পর গুপ্তবংশের অধীনে মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। ইনি লিচ্ছবির রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে তাঁর শক্তিবৃদ্ধির পথ সুগম করেন। তাঁর রাজ্যসীমা মগধ থেকে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

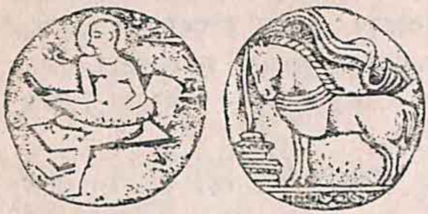
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার

দ্বিতীয় গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীর। আর্যাবর্তের বহু রাজাকে পরাজিত করে তিনি সমগ্র উত্তরাপথ তাঁর শাসনাধীনে আনেন। তাঁর সামরিক খ্যাতি এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যে, সমতট, কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা এবং পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের কয়েকটি রাজ্য বিনা যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

সমুদ্রগুপ্ত

আর্যাবর্তে প্রভুত্ব স্থাপনের পর সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব উপকূল ধরে সসৈন্যে অগ্রসর হন দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে। এই অঞ্চলের বহু রাজা পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশ্য সমুদ্রগুপ্ত এই সব রাজ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ

শাসন স্থাপন করেননি। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ ও শকরাজারা তাঁর প্রভুত্ব মেনে চলতেন। তাঁর সার্বভৌম শক্তির খ্যাতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের পর মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল। সৌরাষ্ট্র ছাড়া আরও যে ক'টি অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল বঙ্গদেশ এবং সিন্ধুনদের অপর তীরে অবস্থিত বাহ্লীক জাতির অধিকৃত অঞ্চল। বিদর্ভের রাজকন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করে তিনি মধ্য ভারতেও প্রভাব বিস্তারের পথ সুগম করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

চতুর্থ গুপ্তসম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত। নতুন কোন রাজ্য জয় না করলেও ইনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করেছিলেন। নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি একদিকে গ্রহণ করেন মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি, অপর দিকে অনুষ্ঠান করেন অশ্বমেধযজ্ঞ।

গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। একদিকে মধ্য ভারতে পুষ্যমিত্র এবং অপর দিকে হূনদের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ পতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটেরা পূর্ব ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে তাঁদের প্রভুত্ব রক্ষা করতে পারেননি।

প্রাচীন বাংলা

বাঙালীর বাসভূমি বাংলা খুব প্রাচীন দেশ। বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত, জৈন এবং বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাংলা কয়েকটি জনপদ বা লোকালয়ে বিভক্ত ছিল। প্রধান প্রধান জনপদগুলি হলো বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সুহ্ম এবং গৌড়। এছাড়া হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, বর্ধমান-কঙ্কগ্রাম এবং তাম্রলিপ্তও ছিল প্রাচীন জনপদ।

প্রাচীন বাংলার জনপদ

বৈদিক সাহিত্য ঐতরেয় অরণ্যকে বঙ্গের উল্লেখ আছে। রামায়ণের বর্ণনা

অনুসারে বঙ্গ মহারাজ দশরথের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। পাহাড়ের মতো বিরাট হাতিতে চড়ে তিনি কুরুরাজ দুর্যোধনের প্রাণ রক্ষা করেন।

বৈদিক সাহিত্যে বাংলার স্থান

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের দস্যু বলা হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায় পুণ্ড্রবর্ধন অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল গঙ্গা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বরেন্দ্রী অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ-সূত্রে রাঢ়া জনপদের উল্লেখ আছে। রাঢ়ার উত্তর সীমায় ছিল গঙ্গা-ভাগীরথী। রাঢ়া জনপদ উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া—এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদী দু'ভাগের সীমারেখা নির্দেশ করতো। বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে রাঢ়ার দু'টি বিভাগ ছিল। বর্তমান হুগলী এবং হাওড়া জেলার কিছু অংশের নাম ছিল সুহ্ম। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধজাতকে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে।

রাঢ়াজনপদ

বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীমূলকল্পগ্রন্থে হরিকেল, সমতট বঙ্গের উল্লেখ আছে। পাণিনির সূত্র এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড় জনপদের উল্লেখ রয়েছে। গৌড়ের গুড় বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের স্বর্ণ, কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের কথা জানা যায়। গৌড় জনপদ বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

গৌড় জনপদ

বাঙালী ব্রাহ্মণদের রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি পরিচয়ের মধ্যে বাংলার প্রাচীন জনপদের পরিচয় আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় যে, পূর্ব ভারতের প্রাসী এবং গঙ্গারিডাই জাতিদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আলেকজান্ডারের সৈন্যদল ভয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল। প্রাসী এবং গঙ্গারিডাই জাতি ছিল বাংলার অধিবাসী। গ্রীক লেখকরা বলেন যে, নন্দ বংশের রাজা জান্ড্রামেস্ প্রাসী এবং গঙ্গারিডাই জাতির রাজা ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে নন্দবংশ ছিল বাঙালী। নন্দরাজগণ মগধের পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

গ্রীক সাহিত্যে বাংলার স্থান

প্রাচীন রোমান পণ্ডিত প্লিনি এবং রোমান কবি ভার্জিল বলেন যে, গঙ্গারিডাই-এর রাজা গঙ্গে নগরে বাস করতেন। গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গে বন্দর থেকে বাংলার বিখ্যাত মসলিন ইউরোপে রপ্তানি হতো।

আলেকজান্ডার-এর ভারত আক্রমণের কয়েক বছর পর চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশ ধ্বংস করে মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের কতখানি অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার পুণ্ড্রনগরে (বর্তমান নাম মহাস্থান) ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি লিপি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তর বঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গে বহু কুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বঙ্গদেশ কুষাণদের অধীনে ছিল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেও কুষাণ মুদ্রা বঙ্গদেশে আসতে পারে।

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমতট ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সব জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটে মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভ নামে একটি ঐতিহাসিক স্তম্ভ আছে। মেহেরৌলি স্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ ঐক্যবদ্ধভাবে জনৈক চন্দ্র নামক একজন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই চন্দ্র হয়ত গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি রচনা করেন। এই প্রশস্তি এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত উত্তরভারতের রাজাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মণ নামে একজন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে আবিষ্কৃত লিপিতে চন্দ্রবর্মণের নাম উৎকীর্ণ আছে। চন্দ্রবর্মণ ছিলেন পুষ্করণের রাজা। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্মণ সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত এলাহাবাদ প্রশস্তির চন্দ্রবর্মণ একই ব্যক্তি ছিলেন।

গুপ্তযুগের আমলে বঙ্গদেশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সময় বুধগুপ্ত নামে একজন গুপ্ত সম্রাট রাজত্ব করতেন। বুধগুপ্তের শাসনকালে রচিত দামোদরপুর তাম্রলিপি অনুসারে উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

ভারত ও বহির্বিশ্ব

পাহাড়, পর্বত ও সমুদ্র ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু এত সুন্দর প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে, বিশেষ করে স্থলপথে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে এবং জলপথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে প্রাচীন ভারতীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। অনেক হিন্দু রাজ্যও এইসব দেশে গড়ে উঠেছিল।

বাণিজ্যের প্রসার

আগেই বলেছি, মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের প্রধান সম্পর্ক ছিল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক। যুগে যুগে পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যও স্থাপন করে। এই বিদেশী জাতিগলির মধ্যে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লোহিত সাগরের ভেতর দিয়ে মিশরের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। পারস্য, সিরিয়া ও এশিয়া-মাইনরের ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত একটি স্থলপথও তৈরী হয়ে ছিল। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর থেকে এই স্থলপথ দিয়ে ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্যের লেনদেন বৃদ্ধি পায়। মধ্য-এশিয়ার খোটান, তুরফান, কাসগড়, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় বণিকেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। বহু ভারতীয় বণিক এইসব অঞ্চলে বসবাসও শুরু করে। শক, পহ্লব ও কুষাণরা মধ্যএশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। মধ্য-এশিয়ার ভেতর দিয়েই চীনের রেশম ভারতে আমদানি করা হতো। বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ভারতীয় শিল্পী, কারিগর ও পণ্য উৎপাদনকারীরা সকলেই এক-একটি বণিক্-সংঘ গড়ে তোলে। কারণ ব্যক্তিগতভাবে কারও পক্ষে সে-যুগে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল না। মধ্য-এশিয়ার দেশগুলোতে ভারত প্রধানতঃ মশলা, মসলিন, সুগন্ধি দ্রব্য, চাল ও গম রপ্তানি করতো। ভারত আমদানি করতো হাতির দাঁত, সুতিবস্ত্র, সোনা ইত্যাদি।

সামাজিক পুনর্বিন্যাস

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া ভারতের সমাজের উপরেও এসে পড়েছিল। শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলোর ভারতে বসবাস করার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে। তারা ভারতীয় রীতিনীতি ও ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজে বিলীন হয়ে যায়। হিন্দুসমাজের কঠোরতা কিছুটা কমে যায় এবং নারীসমাজেও এর পরিবর্তন ঘটে। বিদেশী জাতিগুলির আগমনের ফলে ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। ভারতীয়দের সঙ্গে শক ও কুষাণদের বৈবাহিক সম্পর্কেরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থে শকগণকে নিম্ন-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতের সমাজে বণিকদের প্রাধান্য দেখা যায়। সমাজে বণিকদের মান-মর্যাদা বেড়ে যায়। হূণ, গুর্জর, শক প্রভৃতি জাতিগুলির সঙ্গে ভারতীয়দের মিশ্রণের ফলে রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থেকে বহু বৈশ্য ও শূদ্র ধনবান হয়ে উঠে; ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিদেশী পর্যটকরা আসতেন। তাঁদের বিবরণ থেকে সেকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এখানে মেগাস্থেনিস ও ফা-হিয়েন নামে দুজন পর্যটকের কথা জানাচ্ছি।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

মেগাস্থেনিস

মেগাস্থেনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূতকে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করেন এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রাচীনকালের অনেক গ্রীক লেখক তাঁদের রচনায় মেগাস্থেনিসের বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। এইভাবে মেগাস্থেনিসের গ্রন্থের কোন কোন অংশ রক্ষা পেয়েছে। মেগাস্থেনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। পাটলিপুত্রকে কুসুমপুরও বলা হতো। পাটলিপুত্রের চারদিকে একটি কাঠের প্রাচীর ছিল। তার বাইরে গভীর পরিখা, তাতে শোন নদ থেকে জল আসতো। তাঁর প্রাসাদ দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তিরিশ জন সদস্য মিলে পাটলিপুত্র নগরীর শাসন ব্যবস্থা দেখতেন। তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে ছোট ছোট সমিতি গঠন করা হতো। এক একটি সমিতির উপর এক একটি কাজের ভার যেমন, শিল্পকার্য, বিদেশীদের তত্ত্বাবধান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব প্রভৃতি দেওয়া হতো।

'ইনডিকা'

চন্দ্রগুপ্ত একটি বড় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সৈন্যদের মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক ছিল। তাছাড়া তাঁর সৈন্যরা হাতী ও রথে চড়েও যুদ্ধ করতো। দূর প্রদেশগুলি রাজ প্রতিনিধিরা শাসন করতেন।

সেকালের ভারতবাসীর চরিত্র সম্বন্ধে মেগাস্থেনিস উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীরা সৎ ও সরল প্রকৃতির মানুষ। তারা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। আহার বিহার এবং আচার ব্যবহারে তারা সংযত ও মিতাচারী। দেশে খাদ্যের অভাব নেই। এছাড়া মেগাস্থেনিস ভারতের খনিজ সম্পদের কথা লিখে গেছেন।

ভারতবাসীর চরিত্র

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় চীন দেশ থেকে একজন পর্যটক এই দেশে আসেন। তাঁর নাম ফা-হিয়েন। তিনি এখানে বৌদ্ধ পুঁথির সন্ধানে আসেন। যে সব শহরে বৌদ্ধরা থাকতেন, ফা-হিয়েনের সে সব জায়গা দেখার ইচ্ছে হয়। সেজন্য তিনি পেশোয়ার, তক্ষশিলা মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, বারাণসী, পাটলিপুত্র, গয়া প্রভৃতি নগর পরিভ্রমণ করেন। তাতে তাঁর ছয় বছর সময় লাগে। ফা-হিয়েন সংস্কৃত ভাষা শিখে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর হতে জাহাজে করে সিংহলে যান। সেখানে দু'বছর থেকে যবদ্বীপ হয়ে দেশে ফেরেন। তিনি আমাদের দেশ থেকে অনেক পুঁথি সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন।

ফা-হিয়েন ও তাঁর বিবরণ

ফা-হিয়েনের লেখা ভারতবর্ষের একটি বিবরণ আছে। তাতে প্রধানতঃ তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা এদেশে কেমন ছিল সে কথা বলেন। ধর্ম ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। তাহলেও তাঁর বিবরণ পড়ে গুপ্ত যুগে দেশের অবস্থার কথা জানা যায়। গঙ্গা নদীর তীরবর্তী নগরগুলোর ঐশ্বর্য দেখে ফা-হিয়েন বিস্মিত হন। তিনি বলেন, নগরে অনেক লোকের বাস, অধিবাসীদের অবস্থাও খুব স্বচ্ছল। পাটলিপুত্রে একটি বড় চিকিৎসালয় ছিল। নগরের অধিবাসীরা এর ব্যয় বহন করতো। অপরাধীদের শাস্তি খুব কঠোর ছিল না, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো না বললেই চলে। ইচ্ছেমত রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যেতো ; তাতে কোনরকম বাধানিষেধ ছিল না।

এ দেশে যে চীনের মত বাড়িতে শূকর অথবা মুরগী পোষার রীতি ছিল না ফা-হিয়েন সে-কথাও লেখেন। আহারের জন্য জীবহত্যা হতো না। চণ্ডালেরা অবশ্য এসব বাধানিষেধ মানতো না। তারা নগরের বাইরে থাকতো।

ফা-হিয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের কথা আছে। সেখানে বৌদ্ধ শ্রমণরা থাকতেন। এক মথুরা নগরেই কুড়িটি সংঘারাম ছিল। এইসব সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভূমিদান করতেন।

ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি

সভ্যতা কথাটি নিছক একটি শব্দ নয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ভাষা ও সাহিত্য

বর্তমানে ভারতের সব ভাষারই মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতের প্রাধান দুটি ভাষা গোষ্ঠী—আর্য ও দ্রাবিড়। ভারতীয় আর্যদের ভাষা সংস্কৃত। বহুদিনের ব্যবহারের ফলে সংস্কৃত ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটে ছিল। সাধারণ মানুষ আবার নানা ভাষায় অদের মনের ভাব প্রকাশ করতো। এগুলিকে বলা হতো প্রাকৃত ভাষা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাবে প্রাকৃত ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অশোকের শিলালিপিগুলি প্রাকৃত ভাষাতেই খোদিত হতো। ঐ সব শিলালিপির অধিকাংশই লেখা হতো ব্রাহ্মী হরফে এই ব্রাহ্মী হরফগুলি থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অক্ষর-গুলির সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষাতেই বেদ এবং বিশাল বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়। এই ভাষাতেই ভারতের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। প্রথমে লেখার চল ছিল না। এগুলো গাথার আকারে বহু যুগ ধরে লোকের মুখেমুখে চলে আসছিল। গুপ্তযুগে এগুলি সংকলিত হয়। গুপ্তযুগেই সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতে বিখ্যাত নাট্যকাররা নাটক রচনা শুরু করেন। এইসব নাট্যকারের মধ্যে অশ্বঘোষ, ভাস এবং কালিদাসের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কালিদাস শুধু নাটক রচনা করেননি। তিনি ছিলেন কবি

এবং কয়েকটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। 'শকুন্তলা' কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি বিখ্যাত।

শিল্পকলা

সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পর প্রায় এক হাজার বছর পরে ভারতে কোন শিল্পকলার বিকাশ ঘটেনি। মৌর্যযুগে বিভিন্ন স্তম্ভ, স্তূপ, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মিত হয়। কাশীর কাছে সারনাথের স্তম্ভ ও ভূপালের সাঁচী স্তূপ মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। কুষাণ যুগে গ্রীক, রোম ও ভারতীয় শিল্পকলার মিলনে গান্ধার শিল্প নামে এক অপূর্ব শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে। এই রীতিতে গ্রীক দেবতাদের অনুকরণে সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি তৈরি হতে থাকে। মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি নগরীগুলিতে ভারতীয় রীতিতে অনেক মূর্তি নির্মিত হতো। গুপ্তযুগে বহু দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয়। মূর্তি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্থাপত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়।

অজন্তার গিরিগুহাগুলি গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন।



অজন্তার একটি বিখ্যাত চিত্র

এই গুহাগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য তৈরি হয়েছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ শিল্পীদের দক্ষতায় এই গিরিগুহাগুলির ভেতরের অংশ ও দেওয়ালগাত্রগুলিতে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গুহাগুলিতে আজও যে চিত্র রয়ে গেছে, সেগুলি থেকে আমরা গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পীদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাই।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন **জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট** এবং **বরাহমিহির**।

বিজ্ঞান

আর্যভট্টই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। বরাহ-মিহিরের 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ বিজ্ঞান জগতের এক মহামূল্য সম্পদ। প্রাচীন ভারতে গণিতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। গুপ্তযুগের পূর্বে ভারতীয় গণিত পাটিগণিত এবং বীজগণিত —এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের সাহায্যে সকল অংক লিখন, দশমিক পদ্ধতি, বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অগ্রগতির কথা ব্যক্ত করে। দিল্লীর নিকট চন্দ্ররাজ নির্মিত লৌহস্তম্ভ ভারতীয় ধাতুশিল্পের চরম নিদর্শন। পনের শ' বছর পূর্বের তৈরী এই স্তম্ভে আজ পর্যন্ত কোন মরচে ধরেনি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারত উন্নত ছিল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন **চরক ও সুশ্রুত**। মৌর্যযুগ থেকেই ভারতে জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল ও পশু চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। গুপ্তযুগে

চিকিৎসা বিজ্ঞান

জীবদেহ কেটে পরীক্ষা করবার রীতি ও মোমের মূর্তির উপর অস্ত্রোপোচার করে দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো।

বাল্যকাল থেকে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করা ছাড়াও প্রাচীন ভারতে উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য ভারতের

উচ্চশিক্ষা

বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন। এখানে ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ধরণের পাঠ্যক্রম চালু ছিল। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা চাণক্য বা কৌটিল্য, ব্যাকরণ রচয়িতা পাণিনি এবং বিখ্যাত চিকিৎসক চরক এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল গুপ্তযুগে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে অধ্যয়নের জন্য দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র আসতো। হিউয়েন সাঙ নিজে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বাঙলী মনীষী পণ্ডিতপ্রবর শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

(ক) আর্য নামটি কিভাবে এল ? ভারতে আর্যরা কোন্ পথে এসেছিল ? তারা কিসের জন্য অতি সহজে স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে ?

(খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? এটি ক'টি এবং কি কি ভাগে বিভক্ত ছিল ?

(গ) ভারতীয় আর্যদের ইতিহাসের প্রধান উৎস কি ? বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল ? প্রথম অবস্থায় আর্যদের ধর্মের রূপ কি ছিল ?

(ঘ) আর্য সমাজে কিভাবে জাতিভেদ প্রথার প্রতিষ্ঠা হয় ? আর্যদের জীবন কয়টি আশ্রমে বিভক্ত ছিল ? আশ্রমগুলির নাম কি ?

(ঙ) প্রাচীন ভারতে দু'টি মহাকাব্যের নাম কি? এই দুটি মহাকাব্য থেকে আর্যসভ্যতা সম্বন্ধে কি কি তথ্য জানা যায়?

(চ) জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হলো কেন? জৈনধর্ম কে প্রচার করেন? তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ছ) বুদ্ধদেবের ছোটবেলার নাম কি ছিল? তাঁর বুদ্ধ নাম কেন হলো? বুদ্ধদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(জ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কোন্ বিদেশী সেনাপতির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন? যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

(ঝ) অশোক যুদ্ধ করে কোন্ দেশ জয় করেন? ঐ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? যুদ্ধের ফলে অশোকের জীবনে কি পরিবর্তন আসে?

(ঞ) শ্রেষ্ঠ গুপ্তসম্রাটের নাম কি? তাঁর রাজ্য জয়ের বর্ণনা দাও।

(ট) কুষাণদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত কোন্ কোন্ বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন?

(ঠ) প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনপদের নাম কর। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

(ড) মেগাস্থেনিস এবং ফা-হিয়েন কোন্ কোন্ ভারতীয় সম্রাটের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন? তাঁরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলেন? তাঁরা ভারতের সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে কি লিখে গেছেন?

(ঢ) কিভাবে ভারতের সাথে বিদেশের যোগাযোগ ঘটে? মধ্য এশিয়ার সংগে ভারতের যোগ কিভাবে ঘটেছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

(ণ) প্রাচীন ভারতে কোন্ ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্য রচিত হয়? প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত কবি, একজন নাট্যকার, একজন জ্যোতির্বিদ এবং একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নাম কর।

(ত) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

ডানদিকের সারি থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন বেদ	সামবেদ, অথর্ব বেদ, ঋক্‌বেদ, যজুঃবেদ
(খ) বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন	চন্দ্রগুপ্ত, আনন্দ, বিন্দুসার।
(গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল	কণৌজে, পাটলিপুত্রে, সিংহলে।
(ঘ) শকুন্তলা নাটকের রচয়িতা	ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস।
(ঙ) আর্যভট্ট ছিলেন একজন	রাজনীতিবিদ, অস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ।
(চ) অজন্তার গিরিগুহাগুলি নির্মিত হয়	হিন্দু সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য।
(ছ) 'সূর্য সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের রচয়িতা	চাণক্য, কালিদাস, বরাহমিহির।

———